ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

মূল
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশনা
২৭ [সাতাইশ]

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ্ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৩০০ টাকা মাত্র

আল্লাহর নামে শুরু করছি; যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান

আমাদের কথা

তরুণ প্রজন্ম হচ্ছে সমাজের চালিকাশক্তি। এজন্য তরুণরা বিপথগামী হলে পুরো সমাজ বিপথে যেতে বাধ্য। আর তারা যদি সুপথে পরিচালিত হয়, তা হলে অন্যরাও তাদের অনুসরণ করে। আজ তরুণ প্রজন্ম শরীয়তের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে মুসলিম সমাজ ক্রমশ নিস্প্রাণ হয়ে পড়ছে। একজন মুসলিম যুবককে অপর একজন অমুসলিম যুবকের সাথে তুলনা করলে দু'জন প্রায় সমান প্রমাণিত হয়। দু'জনকেই পাওয়া যায় দুনিয়ামুখী হিসেবে। এজন্য যুবসমাজকে আল্লাহ ও আখেরাতমুখী করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এর জন্য দরকার বহুমাত্রিক তৎপরতা। খুব দুঃখের বিষয় যে, যুবসমাজকে শরীয়তের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ আমাদের মধ্যে নেই বলেই চলে।

আল-হামদু লিল্লাহ, সৌদী আরবের প্রখ্যাত আলেমে দীন ডক্টর মাওলানা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী মুসলিম তরুণ সমাজকে নবীচরিতের আলোকে জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বহুবিধ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। সভাসেমিনারে বক্তৃতা করছেন; টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করছেন। বইপুস্তক রচনা করছেন। এমন কি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও তিনি তুমুলভাবে সক্রিয়।

বক্ষ্যমাণ পুস্তকটি ডক্টর সাহেব যুবসমাজের উদ্দেশ্যেই লিখেছেন। ধর্মীয়

শিক্ষাবঞ্চিত যুবসমাজের বিবেকের দরজায় তিনি কড়া নেড়েছেন এই পুস্তকে। নবী আলাইহিস সালামের পয়গাম মেলে ধরেছেন তাদের সামনে। এর আগে আমরা ডক্টর আরিফী'র কয়েকটি গ্রন্থ বাংলা তরজমা করে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছি। যেমন, জীবন উপভোগ করুন, মহাপ্রলয়, পরকাল, মৃত্যুর বিছানায়, কবরপূজারী কাফের, ইউনিভারসিটির ক্যান্টিনে ইত্যাদি। পাঠকসমাজ সেগুলো শুকরিয়ার সাথে কবুল করেছেন। আশা করি, এই পুস্তকটির বেলায়ও ব্যতিক্রম হবে না।

আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে দুনিয়ার বড় বড় মুসলিম লিখিয়েদের ধর্মীয় লেখা অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা যায়। এ পর্যায়ে মুসলিম দুনিয়ার আরেক প্রথিতযশা লেখক ডক্টর আয়েয আলকরনী 'হতাশ হবেন না' গ্রন্থটি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি। তাঁর আরও কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তা ছাড়া, ডক্টর আবদুর রহমান আসসুদাইস, মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী, ডক্টর সালেহ আল-মুনাজ্জিদ, রাবে হাসান নদভী ও ডক্টর বেলাল
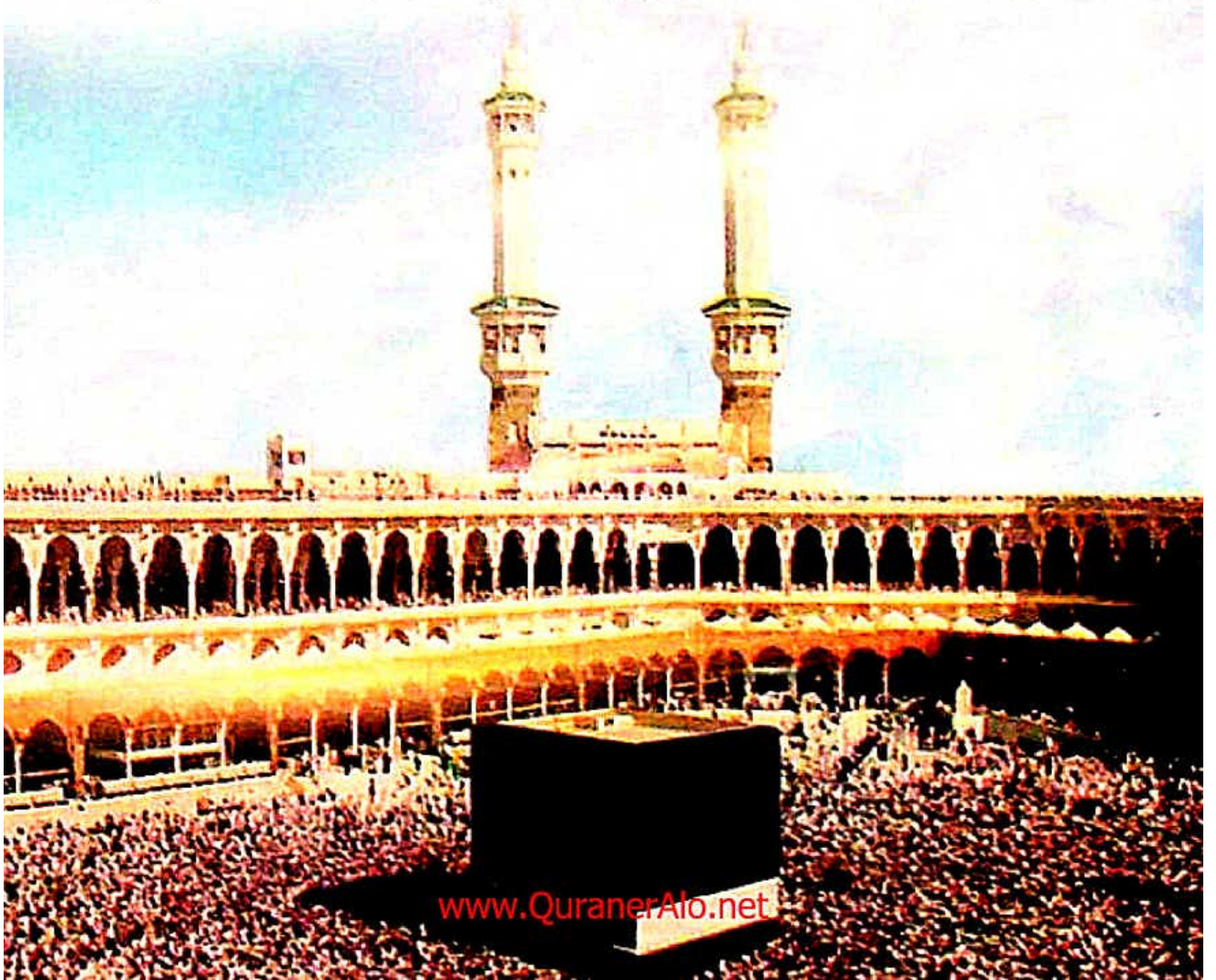
ফিলিপ্সের মত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের গ্রন্থাবলি অনুবাদের আওতায় আনার চিন্তাভাবনা চলছে। বাকী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির উপর মৌলিক গ্রন্থ রচনা, কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধ অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত ও সমৃদ্ধ বাংলা তাফসীর, বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের তরজমা এবং জাতি গঠনমূলক গল্প ও ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়নের মত বিষয়গুলিও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা তৌফীক দিলে এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। কামিয়াবীর জন্য সবার দোআ কামনা করছি।

প্রত্যেকটি বইপুস্তক আমরা সাধ্যমত ত্রুটিমুক্ত করতে চেষ্টা করি। তারপরও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকেই যায়। আশা করি, কারও নজরে পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ, আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা
৬ সফর, ১৪৩৮ হিজরী, ৭ নভেম্বর, ২০১৬ ইং

কেন এই উদাসীনতা?

বরাবরের মতো সেদিনও আমি যথারীতি কলেজে গেলাম। বি.এ. ক্লাসে প্রবেশ করলাম। সামনে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট ছাত্ররা বসা। সেদিন আমার লেকচারের বিষয় ছিল 'সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। আমি ছাত্রদের সামনে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, তাদের জানার পরিধি ও জ্ঞানের গভীরতাটা একটু যাচাই করে নিই। ভাবনা অনুযায়ী কাজ। জিজ্ঞাসা করলাম–

প্রিয় ছাত্ররা! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কোনো চারজন স্ত্রীর নাম বল তো...

এত সহজ প্রশ্ন করে ভিতরে ভিতরে আমি কিছুটা বিব্রত ও লজ্জা বোধ করছিলাম। কেউ হয়তো ভাববে– আরে! বি.এ ক্লাসের ছাত্রদেরকে করার মতো এটাও কি একটা প্রশ্ন হল?!

ক্লাসে চল্লিশজন ছাত্র ছিল। তাদের একজন হাত উঠিয়ে বলল, ডক্টর সাহেব! আমি বললাম, হাঁ, বল। সে উত্তর দিল– খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা।

শাবাশ! বলে আমি হাতের আঙ্গুলে গুণতে শুরু করলাম। কিন্তু সে আর কোনো নাম বলতে পারল না। চুপ হয়ে গেল। এরই মধ্যে অপর এক ছাত্র হাত উঠিয়ে বলল– ডক্টর সাহেব! আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। আমি বললাম, এই তো বেশ! চমৎকার!

এরপর এ যুবকও চুপ হয়ে গেল। সে-ও আর কোনো নাম উচ্চারণ করতে পারল না। অবশিষ্টরা হয়রান হয়ে বসে রইল। চল্লিশজন ছাত্র সবাই চুপ হয়ে গেল! হাঁ, চল্লিশজন ছাত্র সাবাই-ই চুপ হয়ে গেল!!...

আমি অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের দেখছিলাম আর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা মর্মবেদনার বর্ণমালা বারবার তাদের সামনে আবৃত্তি করছিলাম– আফসোস! আফসোস তোমাদের জন্য!! তোমাদের রাসূলের সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় নেই! তোমরা তোমাদের পবিত্র মা'দের পরিচয়ও জান না! এতটাই উদাসীন তোমরা! কী হবে তোমাদের!...

এরই মধ্যে অপর এক ছাত্র আওয়াজ দিয়ে বলল– ডক্টর সাহেব! ডক্টর সাহেব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকজন স্ত্রীর নাম আমার মনে পড়েছে। আমি বললাম, বল।
সে বলল, আমিনা! আমিনা!!...

তার জওয়াব শুনে আমার মাথায় হাত! বললাম, আরে নাদান! আমিনা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়ের নাম! আল্লাহ তোমায় হেদায়েত দান করুন!...

ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল; একদম চুপ হয়ে গেল।

অবস্থা দেখে তাদের একজন ভাবল, আমি এমন এক জওয়াব দিব, যাতে ডক্টর সাহেবের চেহারায় ছেয়ে যাওয়া হাতশার মেঘ দূর হয়ে যায়। তাই সে বলল, ডক্টর সাহেব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকজন স্ত্রীর নাম আমার স্মরণ হয়েছে। বললাম, বল, তাঁর নাম কী? সে বলল, ফাতেমা!!...

তার উত্তর শুনে কিছু ছাত্র হেসে ফেলল। কেউ কেউ তাজ্জবের দরিয়ায় ডুবে গেল। তৃতীয় আরেকটি দল ছিল সেইসব ছাত্রের, যাদের কোনো খবরই ছিল না যে কী হয়েছে! কারণ, তাদের ধারণায় উত্তর সঠিকই হয়েছে। তাদের মতেও 'ফাতেমা' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীর নাম।... আস্তাগফিরুল্লাহ!

আমার হতাশা ও মর্মবেদনা বহুগুণ বেড়ে গেল। বললাম, আরে বেখবর! আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়েত দান করুন! ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে ছিলেন!

এ ছাত্রটির অবস্থাও হল তার পূর্ববর্তীদের ন্যায়। তার উপরও নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। বরং সকল ছাত্রই একদম চুপ হয়ে গেল।

সকলেই চুপচাপ। কিছুক্ষণ এভাবেই কেটে গেল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা আমাকে কোনো ফুটবল টিমের পাঁচজন খোলোয়াড়ের নাম বল। এ বলে আমি কাছাকাছি ও জানাশোনা কোনো টিমের নাম বললাম না; বরং এমন এক টিমের নাম জিজ্ঞাসা করলাম, যার খেলোয়াড়দের নাম আমার ধারণায়ও ছিল না। ভেবেছিলাম তারা আমার এই প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারবে না। যাহোক তাদেরকে বললাম, তোমরা ব্রাজিলের ফুটবল টিমের খেলোয়াড়দের নাম বল!

ব্যস, প্রশ্নটা করতে যতটুকু দেরি! পুরো ক্লসরুমে 'আমি বলছি... আমি বলছি...' রব পড়ে গেলে; পুরো রুম গর্জে উঠল। অতঃপর একের পর এক খেলোয়াড়ের নাম উচ্চারিত হতে লাগল; বলা ভালো গর্জিত হতে লাগল– রোনাল্ডো... টিডো... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি হাতের আঙ্গুলে নামগুলো গুণতে শুরু করলাম। গুণতে গুণতে এক হাতের আঙ্গুল হয়ে গেল। অতঃপর আরেক হাতে গুণতে শুরু করলাম। ওই হাতের আঙ্গুলগুলোও শেষ হয়ে গেল। আমি পুনরায় ডান হাতে গুণতে শুরু করলাম। যখন তারা পনেরোতম খেলোয়াড়ের নাম পর্যন্ত পৌঁছল, তখন আমি তাদের বললাম, ব্যস্ ব্যস্, থামো! আমি যদ্দুর জানি, কোনো টিমে এগারো জনের বেশি খেলোয়াড় থাকে না। তোমরা পনেরো জনের নাম পেলে কোথায়? তারা উত্তর দিল, আমরা সতর্কতামূলক পুরোনো খেলোয়াড়দের নামও বলে দিয়েছি।

আশ্চর্য! তাদের অবস্থাটা খানিক অনুভব করার চেষ্টা করুন!

আরও লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, যখন তারা খেলোয়াড়দের নাম বলছিল আর আমি আঙ্গুলে গণনার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে সঙ্গে নামগুলো উচ্চারণও করছিলাম, তখন ভুলবশত আমি যদি কোনো খেলোয়াড়ের নাম ভুল উচ্চারণ করতাম, তা হলে সেটাকে তারা আমার অজ্ঞতা মনে করে হাসত যে, ইনি তো দেখি খেলোয়াড়দের নামও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেন না! সাথে সাথেই তারা পুনরায় সেই নাম উচ্চারণ করে আমাকে শুধরে দিত যে, আপনি যেভাবে উচ্চারণ করেছেন, তা ভুল। সঠিক হচ্ছে এই...

আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন–

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ .

তারা কি তাদের রসূলকে চিনে না? ফলে তারা তাকে অস্বীকার করে।

[সূরা মু'মিনূন : ৬৯]

মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ো না

তারা আমার চেহারায় পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার ছাপ অনুভব করতে পেরেছিল। তাই অপারগতা প্রকাশ করে কৈফিয়তের সুরে বলল, ডক্টর সাহেব! আমাদের তিরস্কার করবেন না। এতে আমাদের কোনো দোষ নেই। মূলত মিডিয়া এ সকল খেলোয়াড়দের নাম এতবেশি প্রচার ও পরিচিত করে তুলে যে, তাদের নাম আমাদের এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যায়!

আমি তাদের বললাম, মিথ্যা বাহানা বানিয়ো না; খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ো না। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য খবরাখবর প্রচার করা ও দৃশ্যপটে নিয়ে আসার অধিকার মিডিয়ার আছে, কিন্তু মিডিয়ার এ ক্ষমতা কখনোই নেই যে, তোমাদেরকে অমুসলিম খেলোয়াড়দের

মতো আকৃতিধারণ ও সাদৃশ্যগ্রহণ করতে বাধ্য করবে; তাদের আচার-আচরণ ও স্টাইল আপন করে নিতে জোর-জবরদস্তি করবে; এবং তোমাদেরকে এ হুকুম দিবে যে, তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল।

বরং তোমরাই সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করে তাদের খবরাখবর অনুসন্ধান কর; তাদের নাম মুখস্থ কর; তাদের গল্প-কাহিনী বারবার চর্চা কর...

দেখ! মিডিয়া আমাদেরকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওইসকল খেলোয়ারড়দেরকে আলোচনার বিষয়বস্তু বানাতে বাধ্য করেনি; আমাদের চালচলন, ওঠাবসা, কথাবার্তা, আকৃতি-গঠন, রঙ-ঢঙ, কাপড়-চোপড় ও খাবার-দাবারসহ যাবতীয় কিছু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বরকতময় জীবনের মতো করে গড়ে তোলার পরিবর্তে কাফের খেলোয়াড়দের মতো করে গড়ে তুলতে বাধ্য করেনি। আফসোস! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ঘোষণা শোননি–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। *[সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১]*

তা ছাড়া মিডিয়ার ওজর দেখানো একেবারেই ভিত্তিহীন। কেননা, একদিকে যেমন খেলাধুলা, সিনেমা, ফিল্ম ইত্যাদি প্রচারের উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে, অপরদিকে তেমনই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন প্রচার-প্রসারের উপকরণও বর্তমান আছে। অবশ্য আমি এটা স্বীকার করি যে, অশ্লীল ও বেহায়াপনার কাল্‌চারের বিপরীতে ধর্মীয় কৃষ্টি-কাল্‌চার ও সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম ও উপকরণ তুলনামূলক কম; ভালো ও গ্রহণযোগ্য পত্রিকার সংখ্যা কম, অপরদিকে টিভি চ্যানেলসহ ইন্টারনেটের প্রায় অধিকাংশ প্রোগ্রামই পথভ্রষ্টকারী ও রুচিবোধ-বিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের তো কেউ বাধ্য করেনি যে, আমরা দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা ছেড়ে তাদের

পদাঙ্ক অনুসরণ করব, যারা নিজেরাও দ্বীন-ধর্ম থেকে বঞ্চিত, এবং অন্যদের জন্যও দ্বীন-ধর্ম থেকে বঞ্চিত হওয়ার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করছে!

আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনুন! কিছু দিন আগে আমি একটি গ্রামে লেক্চার দিয়েছিলাম। আমি আবারও বলছি– সেটি কোনো শহর বা উপশহর ছিল না, সেটি ছিল একটি গ্রাম। সেখানে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত।' আলোচনা শেষে আমি তাদের সামনে সীরাতে নববীর অধ্যয়ন ও তার পরিপূর্ণ অনুসরণে সচেষ্ট হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে আমি ও আমার ছাত্রদের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ শুনালাম। আমার ঠিক সামনেই একদম মুখোমুখী হয়ে বসা ছিল কয়েকটি অল্প বয়সী ছেলে। যাদের বয়স ১০ এর বেশি হবে না। ওই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাদেরকে বললাম– 'আমি আমার ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কোনো চারজন স্ত্রীর নাম বল...' অতঃপর আমি তাদেরকে সেই ঘটনার আদ্যোপান্ত এমনভাবে শুনালাম, যেভাবে সাধারণত সকলেই শুনিয়ে থাকে। কিন্তু যখন আমি তাদেরকে বললাম যে, 'আমি আমার ছাত্রদেরকে ব্রাজিলের পাঁচজন খেলোয়াড়ের নাম জিজ্ঞাসা করলাম...' তখন আমার সামনে বসে থাকা সকল ছেলেই চিৎকার দিয়ে বলে উঠল– 'আমি বলব... আমি বলব...'

বেচারারা মনে করেছিল– এ প্রশ্ন আমি খোদ তাদেরকেই করেছি। প্রিয় পাঠক! এই ঘটনাকে আমি সংরক্ষণ করা জরুরি মনে করলাম এবং মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপমা হিসেবে গনীমতরূপে গণ্য করলাম। যাহোক, আমি তাদের একজনের দিকে মনোযোগী হলাম এবং বললাম, ওহে দুষ্টু! তুমিই এর উত্তর দাও। সে বলতে শুরু করল– রোনাল্ডো...

ছেলেটি আরও নাম উচ্চারণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ব্যস্, এটুকুই যথেষ্ট। অতঃপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরে পুচকে! তুমি কোন ক্লাসে পড়? সে কোনো রকম ইতস্ততা না করে অকম্পিতভাবে উত্তর দিল, চতুর্থ শ্রেণির খ গ্রুপে।

এরপর আমি আরেকজনের দিকে তাকিয়ে বললাম, হ্যাঁ, এবার তুমি বল। সে বলতে শুরু করল– টিডো... আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোন ক্লাসে পড়? ছেলেটি উত্তর দিল, পঞ্চম শ্রেণির ঘ গ্রুপে।

আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে এল। পরবর্তীতে আমার থেকে এ দুঃখজনক ঘটনা শুনে আরও অনেকেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ যখন নিজের মহান পথপ্রদর্শককে ভুলে সেইসমস্ত লোকের অনুসরণ-অনুকরণে লেগে যায়, যাদের প্রতিটি কথা ও কাজের ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা ও বেয়াদবির উপর; মুসলমানের সন্তানরা যখন অমুসলিমদের কাল্চারের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন আসমান ফেটে যাওয়া ও জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাওয়াই উচিত; এবং মানুষের চোখ থেকে অশ্রুর পরিবর্তে রক্তের নদী প্রবাহিত হওয়া উচিত।

আমি যখন মুসলমানদের সন্তানদেরকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এতটা অপরিচিত ও অচেনা দেখলাম, তখন আমার অন্তর আমাকে তিরস্কার করল; ভর্ৎসনা করল। আমি বুঝতে পারলাম, এ সময়ে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম আদর্শকে সমগ্র জগতের সামনে ব্যাপক করে দেওয়া। যেন সবদিক থেকেই আওয়াজ ওঠে– যদি কাউকে মডেল বানাতে হয়, যদি নিজেদের পরিবেশ পবিত্র করতে এবং

তাহযীব-তামাদ্দুনের জন্য কাউকে আদর্শ বানাতে হয়, তা হলে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বানানো হবে; তাঁরই আলোচনা করা হবে; নিজেদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কমতিগুলো তাঁরই বাণী ও আমলের আলোকে বিশুদ্ধ করা হবে। পাশাপাশি প্রতিটি শিশুর মুখে যেন খেলোয়াড়দের নামের পরিবর্তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারিত হয়। কারণ, তিনি আমাদের নিকট আমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।

প্রিয় পাঠক! আপনার হাতের এই সংক্ষিপ্ত বইটি পবিত্র সীরাতের মুক্তো বেছে বেছে সংকলন করা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা ও তাঁর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণাদি লিখিত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন প্রতিটি ক্ষণ কীভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম আদর্শের আলোকে অতিবাহিত করব তারও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। যাতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ দানে ধন্য করেন।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে কামনা– এই বইটি যেন সারা পৃথিবীতে সাইয়িদুল মুরসালীন খাতামুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাতের সৌরভ ছড়ানোর মাধ্যম হয়।

আমীন!... আমীন...।

–মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
রিয়াদ, সৌদিআরব

(১)
নবীজীর বংশ-পরিচয়

নবীজীর নাম : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব।

গোত্র : কুরাইশ, বনু হাশেম (বংশীয় পদবী : কুরাইশী, হাশেমী)

উপনাম : আবুল কাসেম।

মায়ের নাম : আমিনা বিনতে ওয়াহ্‌ব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যাহরা ইবনে কিলাব।

মায়ের গোত্র : কুরাইশ, বনু যাহরা (বংশীয় পদবী : কুরাইশিয়্যা, যাহরাইয়্যা)

জন্মস্থান : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তাঁর চাচা আবু তালেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম-তারিখ : ৯ রবিউল আউয়াল, সোমবার, (মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ)

এতিমরূপে লালন-পালন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের পেটে থাকতেই তাঁর সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। বনী সা'দ গোত্রের মহীয়সী নারী হযরত হালিমা বিনতে আবী যুওয়াইব রাযি. তাঁকে দুধ পান করান। ছয় বছর বয়সে সম্মানিতা মাতাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। তারপর দাদা আবদুল

মুত্তালিব তাঁকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং লালন-পালন করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর চাচা আবু তালেব তাঁর দেখাশোনা ও লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

নবীজী সা. এর পবিত্র স্ত্রীগণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম আরবের সম্ভ্রান্ত নারী হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন একজন বিধবা নারী। বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল ২৫ বছর আর হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৪০ বছর। হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। তাঁর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য স্ত্রীদের বিয়ে করেন। তাঁদের নামসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হল–

২. সাওদা বিনতে যামআ রাযিয়াল্লাহু আনহা।

৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহা।

৪. হাফ্‌সা বিনতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহা।

৫. যাইনাব বিনতে খুযাইমা ইবনে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহা।

৬. উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর প্রকৃত নাম হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া।

৭. হযরত যাইনাব বিনতে জাহ্‌শ রাযিয়াল্লাহু আনহা।

৮. হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহা।

৯. হযরত উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তাঁর প্রকৃত নাম রমলাহ বিনতে আবু সুফ্‌য়ান।

১০. হযরত সফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রাযিয়াল্লাহু আনহা।

১১. হযরত মাইমুনা বিনতে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহা। ইনি রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ স্ত্রী।

সন্তানাদি :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিন ছেলে ও চার মেয়ে ছিল। হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার গর্ভ থেকে দুই ছেলে– কাসেম ও আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহর উপাধি ছিল তৈয়্যব ও তাহের। এ দু'জনই বাল্যবয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁদি মারিয়া কিবতিয়্যা'র গর্ভ থেকে এক ছেলে– ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনিও অল্প বয়সেই ইন্তেকাল করেছেন।

কন্যাসন্তান :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার মেয়ে– যাইনাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতেমা রাযি.।

এঁরা সকলেই হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা'র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাকি সকল সন্তানাদি তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেছেন।

নবুওয়ত-সূর্যের জ্যোতি

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানবজাতিকে পাপ-পঙ্কিলতা ও মূর্খতা এবং কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে স্বীয় হেদায়েতের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য সৃষ্টির সেরা মানব ইমামুল আম্বিয়া আহমাদে মুজতবা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্বাচন করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সূচনা হয়েছে সেই প্রথম ওহীর মাধ্যমে, যা নাযিল হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহায় আপন পরওয়ারদিগারের ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকাবস্থায়। তিনি নবুওয়ত ও রিসালাত-সৌধের সর্বশেষ ইট। তাঁর পর ওহী নাযিলের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী বা রাসূল আগমন করবেন না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়তের এমন এক সূর্য, যার আলোকরশ্মি পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের দিবা-রাত্রি আলোকিত করতে থাকবে। তিনি সমগ্র মানবতার জন্য এক মহান পথপ্রদর্শক। যেমন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না। *[সূরা সাবা : ২৮]*

কুরআন নাযিলের সূচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পবিত্র কুরআন নাযিলের সূচনা হয় বরকতময় রমযান মাসের কদর-রাত্রিতে। সর্বপ্রথম নাযিল হয় এই আয়াত–
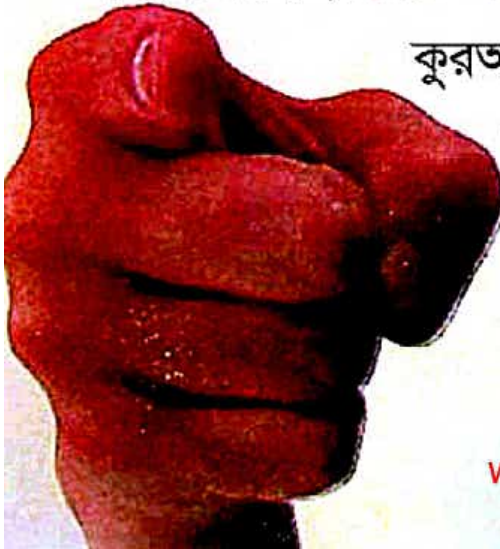
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .

পাঠ কর তোমার পালনকর্তার নামে; যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি জমাট রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর; তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু। *[সূরা আলাক : ১-৩]*

তারপর থেকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে কুরআনে কারীমের আয়াতসমূহ ধারাবাহিকভাবে নাযিল হতে শুরু করে। অতঃপর দীর্ঘ ২৩ বছর মেয়াদে পবিত্র কুরআন নাযিলের ধারা পরিপূর্ণ, সম্পন্ন ও শেষ হয়

গোপনে দাওয়াতের তিন বছর

নবুওয়তপ্রাপ্তির তিন বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেছেন। একজন একজন করে মানুষের কাছে গিয়ে তাদেরকে একত্ববাদের শিক্ষা ও দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করেছেন। তারপর আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন যে, এবার হকের দাওয়াত খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দাও; নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাও। এ আদেশের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তিনি কুফর ও শিরকের অসারতা পরিষ্কার করে দিলেন। ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর পর্দা বিদীর্ণ করে দিলেন। দেব-দেবী ও মূর্তিসমূহের হাকীকত ও বাস্তবতা সকলের সামনে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিলেন যে, এগুলি কেবল মাটির ঢেলা মাত্র। এগুলি কারও কোনো উপকারেরও ক্ষমতা রাখে না, কারও কোনো ক্ষতিও করতে পারে না।

এভাবে ইসলামের পবিত্র দাওয়াত মক্কা মুকাররমা ও তার আশপাশের অঞ্চলসমূহে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠল।

কুরাইশের বড় বড় সরদাররা হকের এ আওয়াজ শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়ল; সীমাহীন ক্রোধে বিস্ফোরিত হল। কারণ, এতে মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদেরকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ যেন ছিল প্রচণ্ড এক বজ্রপাত, যা মক্কার শান্তিপূর্ণ (!) পরিবেশে অপ্রত্যাশিত এক বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে দিল। আর তাই কুরাইশ সরদাররা দাওয়াতে হকের এই পবিত্র আহ্বানকে দমিয়ে দিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। তারা জানত, যদি এখনই এই আহ্বানের সামনে অলঙ্ঘনীয় কোনো দেয়াল দাঁড় করানো না যায়, তা হলে আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত রুসম-রেওয়াজ সব নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে। এ জন্য তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথি-সঙ্গীদেরকে সব রকমের জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের লক্ষ্য বানাতে শুরু করল।

হাবশায় হিজরত

মক্কার মুশরিকদের অসহনীয় জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে মুসলমানদের জন্য মক্কায় বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিয়ে দিলেন। বর্তমানে হাবশাকে ইথিওপিয়া বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম হিজরত।

সে হিজরতে মুহাজির ছিলেন ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী। এর কিছু দিন পরই হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত হয়। তাতে ৮৩ জন পুরুষ, ১৮ জন নারী ও কয়েকজন শিশুও ছিলেন।

নবীজীর হিজরত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরাইশদের বাড়াবাড়ি ও জুলুম-নির্যাতনের সীমা যখন ছাড়িয়ে গেল, এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলারও জঘন্য ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল, তখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন।

মক্কা বিজয়

মদীনায় হিজরতের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের মাঝে বিভিন্ন যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ৮ম হিজরীর রমযান (মোতাবেক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ)-এ মক্কা বিজয় হয়।
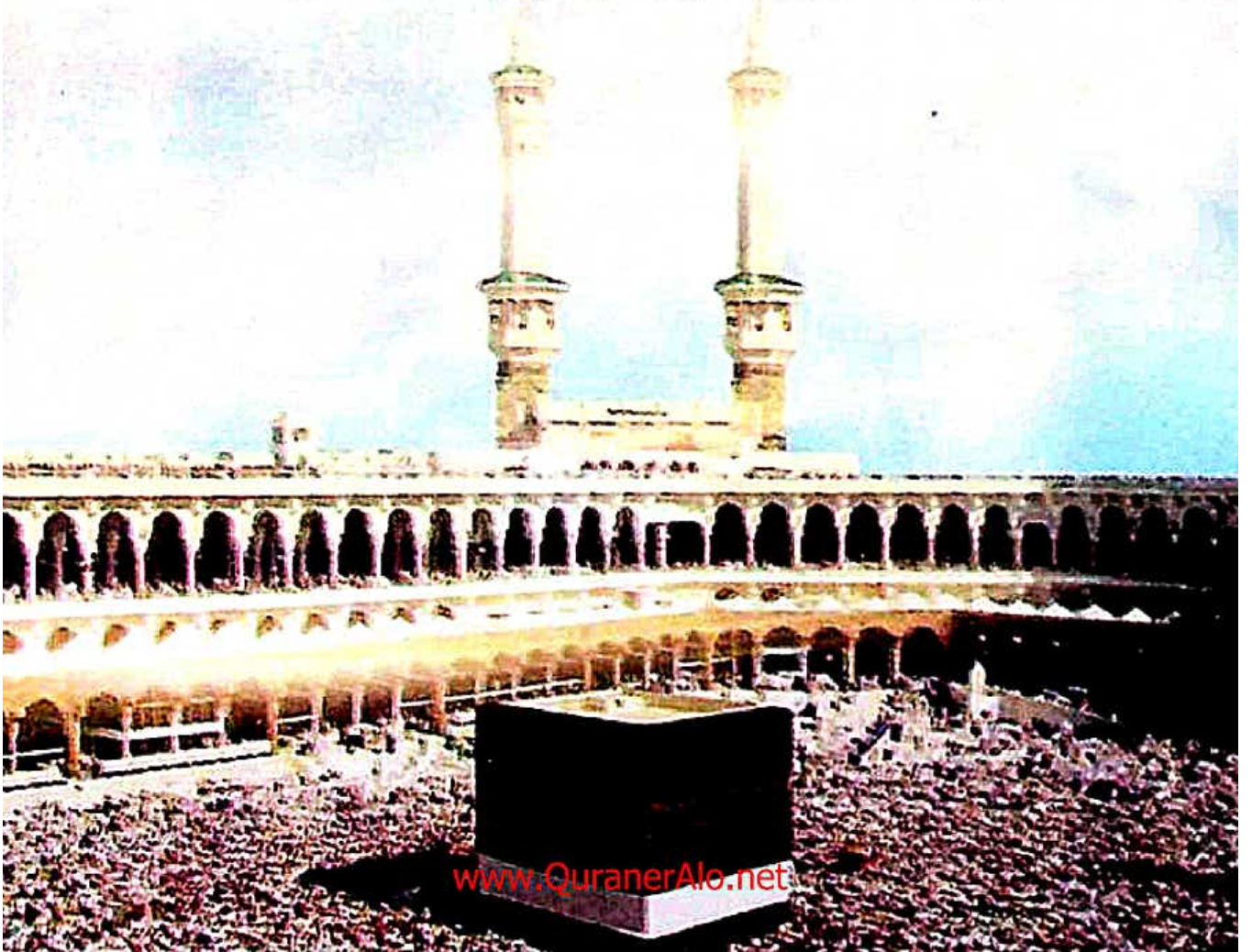
মক্কার মুশরিকরা পরাজিত হয়। আরব উপদ্বীপের যুদ্ধবাজ গোত্রসমূহও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। ৯ম ও ১০ম হিজরী (মোতাবেক ৬৩০ ও ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ)-এ আরবের প্রতিটি কোণ থেকে দলে দলে লোকজন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

বিদায় হজ

১০ম হিজরী (মোতাবেক ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ)-এ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ পালন করে মদীনায় ফিরে আসেন।

ওফাত

মানবতার মুক্তির দূত রাসূলে আরাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী (মোতাবেক ৮ জুন, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ) সোমবার দিন এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে যান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত ছিল ইতিহাসের এক বেদনায়ক অধ্যায়।

إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

নিঃসন্দেহে আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার জন্য এবং নিঃসন্দেহে আমরা সকলে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। *[সূরা বাকারা : ১৫৬]*

(২)
নবীজীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

ইসরা ও মেরাজ : হিজরতের তিন বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে একই রাতে মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন; একে ইসরা বলে। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বজগতের সফর করেন; তাকে মেরাজ বলে। আর তখনই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন।

১ম হিজরী মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব : এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। হিজরত ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফতের আমলে সমস্ত বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যে হিজরতের অপরিমেয় গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে হিজরী সনের সূচনা করা হয়। হিজরী ১ম সনেই মসজিদে নববী নির্মিত হয়; ইসলামী সমাজব্যবস্থার অবকাঠামো গঠন করা হয় এবং সে বছরই যাকাত ফরয হয়
২য় হিজরী মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। হক ও বাতিলের ফায়সালাকারী সর্বপ্রথম যুদ্ধ এটিই।

৩য় হিজরী মোতাবেক ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৪র্থ হিজরী মোতাবেক ৬২৫ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর গায্ওয়ায়ে বনু নযীর সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল ইহুদীদের সঙ্গে।

৫ম হিজরী মোতাবেক ৬২৬ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১. গায্ওয়ায়ে আহযাব (খন্দক যুদ্ধ) ২. গায্ওয়ায়ে বনু কুরাইযা। এ দু'টি যুদ্ধও হয়েছিল ইহুদীদের সঙ্গে।

৬ষ্ঠ হিজরী মোতাবেক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। গায্ওয়ায়ে বনুল মুস্তালিকও এ বছরই সংঘটিত হয়। একে গায্ওয়ায়ে মুরাইসি'-ও বলে।

৭ম হিজরী মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর গায্ওয়ায়ে খাইবার সংঘটিত হয়। এ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালন করেছেন। এটি ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ওমরা।

৮ম হিজরী মোতাবেক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর মুসলমান ও রোমানদের মাঝে প্রচণ্ড লড়াই হয়। ইসলামী ইতিহাসে একে গায্ওয়ায়ে মুতা নামে স্মরণ করা হয়। মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা এ বছরই ঘটে। এ বছরই সাকীফ ও হাওয়াযেন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একে গায্ওয়ায়ে হুনাইনও বলা হয়।

৯ম হিজরী মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর গায্ওয়ায়ে তাবুক সংঘটিত হয়। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিরোধমূলক ও কুফরের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যুদ্ধ। এ বছরই মানুষ দলে দলে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করে। এমনকি এ বছরকে 'আমুল উফূদ' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১০ম হিজরী মোতাবেক ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ করেন। বিদায় হজে নবীজীর সঙ্গে এক লাখেরও বেশি মুসলমান অংশগ্রহণ করেন।

১১ হিজরী মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ : এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

প্রিয় পাঠক! আমি এ বইতে এমনসব বিষয়বস্তুরই অবতারণা করেছি, যেগুলো পাঠ করে আমরা উভয় জাহানের সরদার রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযা ও তাঁর নবুওয়তের অসংখ্য নিদর্শনাবলি দ্বারা উপকৃত হতে পারি। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযার সংখ্যা এক হাজারের চেয়েও বেশি। তবে এখানে আমি কেবল সেসকল মু'জিযার কথাই উল্লেখ করব, যেগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাবে আমি নিজে অধ্যয়ন করেছি।

(৩)
নবী-রাসূলগণের মু'জিযা

বিভিন্ন নিদর্শন ও মু'জিযা প্রদর্শন একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরই বৈশিষ্ট্য। মু'জিযার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরামের রিসালাতকে সত্যায়ন করা। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মাধ্যমে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত করিয়েছেন, যা স্বভাবজাত নিয়মনীতির সাধারণ গতিবিধির পরিপন্থী। এর ফলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন পয়গাম্বরগণের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্যই এ জাতীয় যাবতীয় ঘটনাবলি নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশ করেছেন। মু'জিযা সাধারণ মানুষের ক্ষমতাধীন কোনো বিষয় নয়। প্রত্যেক নবী-রাসূলের মু'জিযা তাঁদের সেসব অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই প্রকাশিত হত, যা তাঁদের নবুওয়তী যামানায় বিদ্যমান থাকত।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের মু'জিযা

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যে যামানায় প্রেরিত হয়েছিলেন, সে যামানায় জাদুবিদ্যার খুব জনপ্রিয়তা ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সে ধরনের মু'জিযাই দান করেছেন। যেমন, তিনি তাঁর হাত বগলের নীচ থেকে বের করলে তা উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকত। তাঁর লাঠি জমিনে নিক্ষেপ করলে তা বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে মাঝখান দিয়ে পথ করে দিয়েছিলেন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মু'জিযা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে যামানায় নবুওয়তলাভে ধন্য হয়েছিলেন, সে যামানায় চিকিৎসা বিদ্যার খুব বেশি চর্চা হত; এবং রোগীদেরকে সুস্থ করে তোলার বিভিন্ন তরীকা ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে 'স্পর্শ' এর মু'জিযা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এ বৈশিষ্ট্যের বদৌলতে তিনি আল্লাহর কুদরতে অসুস্থদেরকে সুস্থ এবং মৃতদেরকে قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ [অর্থাৎ তুমি আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ো যাও।] বলে জীবিত করে দিতেন।

নবীজীর মু'জিযা

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযা দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও সম্মানিত করেছেন; যে সকল বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযা তামাম সৃষ্টিকুলকে অক্ষম ও লা-জওয়াব করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন। এ কুরআন আরবের সুবিখ্যাত প্রসিদ্ধ ও অসাধারণ প্রতিভাধর কবি-সাহিত্যিকদের হতবাক ও নিরুত্তর করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং তাদের হৃদয়ের প্রতিটি অনুও এই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছে যে, এ কুরআন কোনো মানুষের কালাম নয়। জগতের সকল সৃষ্টি মিলেও এ কালামের মতো একটি আয়াতও বানাতে সক্ষম হবে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? (হে মুহাম্মাদ!) তুমি বলে দাও, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তদের সামনে পাঠ করা হয়। নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ; বিশ্বাসী লোকদের জন্য। *[সূরা আনকাবুত : ৫০-৫১]*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনাবলি এত বেশি যে, কারোরই তাঁর নবুওয়তকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একমাত্র সে-ই একে অস্বীকার করতে পারে, যে একগুঁয়ে, গোঁয়ার ও হঠকারী এবং জেনেবুঝে সত্যকে অস্বীকার করার মতো অহংকারী।

যেসকল কাফের-মুশরিকরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে করে তাঁর বেঁচে থাকাটাই দুষ্কর করে তুলেছিল, তারাও মনে মনে তাঁর নবুওয়তের সত্যতায় বিশ্বাসী ছিল। তারা কেবল নিজেদের ভিতরগত কলুষতা, মানসিক বৈকল্য, অত্মম্ভরিতা ও গোঁয়ারতুমির কারণেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হকের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে একমাত্র তাদের অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতাই প্রতিবন্ধক ছিল। কেন, আপনি কি আবু তালেবের এই কবিতা শোনেননি–

وَاللهِ! لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ * حَتّٰى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِيْنَا
وَدَعَوْتَنِيْ وَعَلِمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي * فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ فِيْنَا أَمِيْنَا
وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ * مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ * لَوَجَدْتَنِيْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنَا

[ওহে ভাতিজা!] আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ তারা তাদের লোক-লশ্‌কর নিয়ে এলেও তোমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না; যতক্ষণ না আমাকে মাটিতে দাফন করে দেওয়া হবে। তুমি আমাকে স্বীয় প্রভুর দিকে আহ্বান করেছ, আমি খুব ভালো করেই জানি যে, তুমি আমার কল্যাণ প্রত্যাশী; তুমি তোমার কথায় সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমানতদার তুমি।
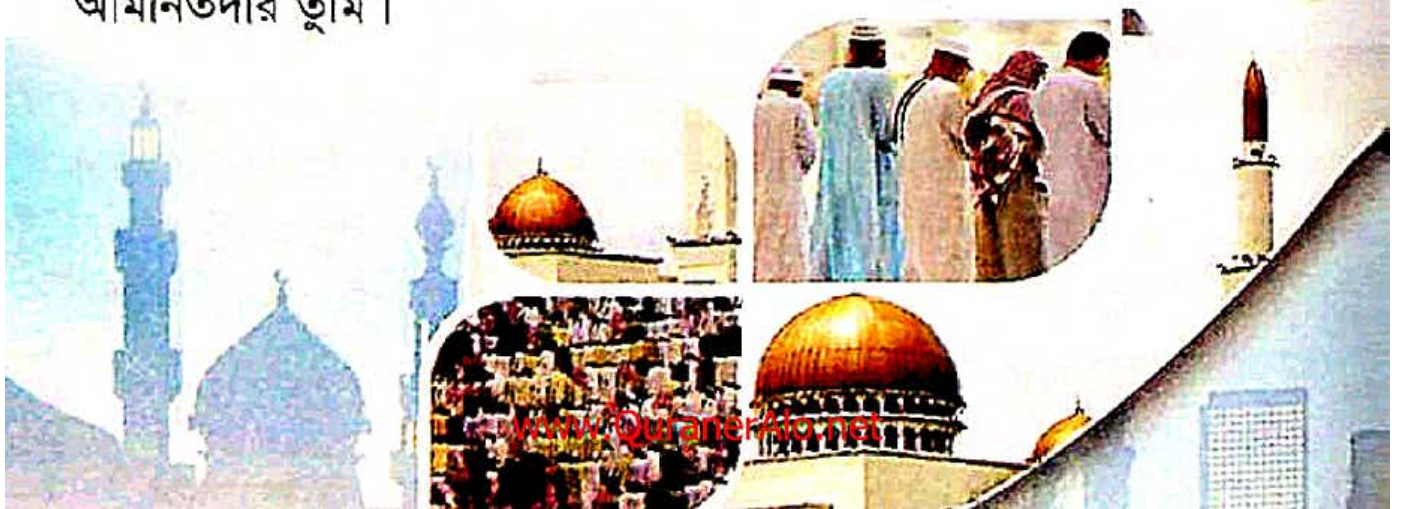
তুমি যে ধর্ম আমাদের সামনে পেশ করেছ, আমি ভালোভাবেই জানি যে, এ ধর্ম সমগ্র জগতের যাবতীয় ধর্ম থেকে উত্তম; সবচেয়ে মহৎ ও বিশ্বব্যাপী ধর্ম। যদি আমি তিরস্কারকারীদের তিরস্কারকে ভয় না করতাম, নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, অপবাদ ও লজ্জার ভয় না করতাম, তা হলে তুমি দেখতে, আমি তোমার আনীত ধর্মের প্রকাশ্য একজন আনুগত্যকারী। *[দালাইলুন্নবুওয়াহ লিল বায়হাকী : ২/৩৪১]*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় এতটাই সুস্পষ্ট ও প্রদীপ্ত ছিল যে, ইহুদী আলেমরাও নবীজীকে প্রথম দেখাতেই চিনে ফেলেছিল যে, ইনিই সেই সত্য নবী, যাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ তাদের কিতাব তাওরাতে দেওয়া হয়েছে। তারা এ-ও জানত যে, তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। তারা কেবল অন্ধ বিদ্বেষ, স্বভাবজাত হঠকারিতা ও গোঁয়ারতুমির কারণেই সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

যাহোক, আমরা এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ কিছু মু'জিযার কথা আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

(৪)

ভবিষ্যৎবাণী ও দূর-দূরান্তের সংবাদ প্রদান

আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ [সা.] কখনও মিথ্যা বলেন না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। কখনও কখনও তিনি এমনসব ঘটনার ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করতেন, যা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ঘুণাক্ষরের ধারণাও কারও থাকত না। কিন্তু দেখা যেত, ঠিক সময়মতোই তা সংঘটিত হয়ে যেত। তার একটি জ্বলন্ত উদারহণ নিম্নের এই ঘটনা–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার ওমরা করতে মক্কায় গেলেন। সেখানে তিনি উমাইয়া ইবনে খাল্ফের ঘরে ওঠলেন। কারণ, এ দু'জনের মাঝে জাহেলী যামানা থেকেই খুব গভীর সম্পর্ক ছিল; তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তা ছাড়া তখন পর্যন্ত কাফের ও মুসলমানদের মাঝে কোনো ধরণের যুদ্ধ-বিগ্রহও শুরু হয়নি।

উমাইয়া যখন শামের উদ্দেশে সফর করত, তখন পথিমধ্যে মদীনায় বন্ধু সা'দের বাড়িতেই অবস্থান করত। সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে বিশ্রাম নিত। তারপর সতেজ হয়ে পুনরায় সফর শুরু করত। একই রীতি ছিল হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু'রও।

তিনিও কোনো কারণে যখন মক্কায় যেতেন, তখন উমাইয়ার বাড়িতেই অবস্থান করতেন।

এ যাত্রায় তিনি উমাইয়ার বাড়ি গিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, উমাইয়া! তুমি তো আমার বন্ধু! এবার তুমি আমার জন্য এমন একটা সময় বের কর, যে সময়ে আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করে আসতে পারব।

উমাইয়া বলল; কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। দ্বিপ্রহরে যখন প্রচণ্ড গরম পড়বে, তখন লোকজন নিজ নিজ ঘরে গিয়ে সব কিছু থেকে গাফেল ও বে-খবর হয়ে যাবে। তখন তুমি আরামে ও নিশ্চিন্তে তওয়াফ করে এসো।

কথামতো সূর্যের প্রচণ্ডতা যখন চরম আকার ধারণ করল, সূর্য যখন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বর্ষণ করতে শুরু করল, লোকজন তখন কাজকর্ম ফেলে রেখে নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। উমাইয়া এ সুযোগে হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে পড়ল। উভয়েই খানায়ে কাবার দিকে রওয়ানা হল।

চলতে চলতে পথিমধ্যে এক জায়গায় মুশরিকদের সরদার আবু জাহ্লের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আবু জাহ্ল ঘুরে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে তাকাল। কিন্তু চিনতে পারল না। সে উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল, আবু সফ্ওয়ান! [উমাইয়া ইবনে খাল্ফের উপনাম] তোমার সঙ্গে এ কে গো?

উমাইয়া জওয়াব দিল, এ সা'দ ইবনে মুআয ইয়াসরিবী। (অর্থাৎ মদীনা থেকে এসেছে।)

আবু জাহ্ল ভাবল, মদীনাবাসীরাই তো সেসব লোক, যারা মুহাম্মাদকে সাহায্য করেছিল।

মুহাম্মাদ যখন হিজরত করে গিয়েছিল, তখন মদীনাবাসীরা তাকে যথেষ্ট সমাদার ও কদর করেছিল। এ জাতীয় আরও বহু ভাবনা তার মাথায় কাঠবিড়ালির ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ভাবতে ভাবতেই সে ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। চিৎকার দিয়ে বলে ওঠল– আচ্ছা! তুমি এখানে আমার চোখের সামনে নিশ্চিন্তে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করছ! অথচ তোমরাই তো মুহাম্মাদ ও সাবীদেরকে [অর্থাৎ বাপ-দাদার ধর্মত্যাগীদেরকে] আশ্রয় দিয়েছিলে!

সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু চুপ রইলেন। একদম চুপ। আবু জাহ্লের কথার কোনো প্রতিউত্তরই করলেন না। আবু জাহ্ল কোনো বাধা না পাওয়ায় পুনরায় বলল, আরে! তোমরা নিজেদেরকে কী মনে কর? তোমরা কি সেইসব বাস্তুহারা, কাঙাল, দেশত্যাগী ও কপর্দকশূন্যদের সাহায্য করবে? আল্লাহর কসম! তুমি যদি আবু সফ্ওয়ানের সঙ্গে না আসতে, তা হলে এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারতে না!

সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নিজ গোত্রের সরদার। আবু জাহ্লের এ ধরনের কথা তাঁর কাছে চরম অসৌজন্যমূলক ও অবমাননাকর বলে বোধ হল। তাই তিনিও বজ্রকণ্ঠে জওয়াব দিলেন, আবু জাহ্ল! তুমি যদি আমাকে তওয়াফ করতে বাধা প্রদান কর, তা হলে আমিও তোমার এমন কাজে বাধা দিব, যা তোমার কাছে এরচেয়ে অনেক বেশি ভারী মনে হবে। যখন তুমি ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে শামের দিকে যাবে, তখন মদীনায় আমি তোমার পথ আটকে দেব। সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতেন আবু জাহ্ল ব্যবসায়ী মানুষ। তার ব্যবসায়িক কাফেলা মদীনা হয়েই শামে যায়। তাই তিনি এ হুমকি দিলেন।

ওদিকে আবু জাহ্ল তাঁর এ হুমকিতে ভড়কে গেল। ফলে সে আরও ক্রোধান্বিত ও উন্মত্ত হয়ে হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সঙ্গে বিবাদ

করতে লাগল। উমাইয়া এ অবস্থা দেখে মুশকিলে পড়ে গেল। সে স্থির করতে পারছে না যে, সে কার পক্ষাবলম্বন করবে! একদিকে হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু; যিনি মদীনায় নিজ গোত্রের সরদার। অপরদিকে আবু জাহ্ল; যে মক্কায় নিজ সম্প্রদায়ের প্রধান। কিছুক্ষণ দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে তার মন আবু জাহ্লের দিকে ধাবিত হয়ে গেল। সে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে উদ্দেশ্য করে বলল– সা'দ! আবুল হাকাম [আবু জাহ্লের জাহেলী যুগের উপনাম] এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না। তুমি কি জান না, ইনি মক্কার সরদার?

হযরত সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, দেখ! তুমি আবু জাহ্লের অত বেশি পক্ষপাতিত্ব করো না। প্রয়োজনে আমি তোমার সঙ্গেও সম্পর্ক চুকে ফেলব। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি তোমাকে হত্যা করে ফেলবেন।

সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ আকস্মিক কথাগুলো উমাইয়ার উপর বজ্রের ন্যায় পতিত হল। কথাগুলো শুনে সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। ঘাবড়ে গিয়ে বলতে লাগল– মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করে ফেলবে?... কোথায়?... মক্কায়?... না অন্য কোথাও?...

সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, এর বেশি কিছু আমি জানি না। উমাইয়ার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। সে ভয় ও আতঙ্কে ঘর্মসিক্ত হয়ে গেল।

বারবার শুধু এ কথাই বলতে বলতে ফিরে গেল– 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ কখনও মিথ্যা বলেন না।' সে তৎক্ষণাৎ তার বাড়ি ফিরে গেল। গিয়েই কম্পিত কণ্ঠে স্ত্রীকে বলল, উম্মে সফ্ওয়ান! জানো, সা'দ কী বলেছে?

উম্মে সফ্ওয়ান : কী বলেছে?

উমাইয়া : সা'দ বলেছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকি মুসলমানদের বলেছেন যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হবে।

কথাগুলো উমাইয়ার স্ত্রীর উপরও বজ্রের ন্যায় পতিত হল। সে-ও ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে বলল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে হত্যা করে ফেলবে?... কোথায়?... মক্কায়?...

উমাইয়া : তা জানি না।

উম্মে সফ্ওয়ান : আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও মিথ্যা বলেন না।

উমাইয়া স্বগতোক্তি করে বলল, আল্লাহর কসম! আমি কখনোই মক্কার সীমানার বাইরে পা রাখব না।

কিছুদিন এভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ একদিন সংবাদ এল; শাম থেকে কুরাইশের যে ব্যবসায়ী কাফেলা ফিরে আসছে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তার পথরোধ করার জন্য রওয়ানা হয়েছেন।

অপরদিকে কাফেলার সরদার আবু সুফ্য়ানও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হয়ে গেল। সে মক্কার কুরাইশের নিকট সংবাদ পাঠল– অতিসত্বর যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড় এবং নিজেদের কাফেলাকে বাঁচানোর চেষ্টা কর।

এ সংবাদ মক্কায় এসে পৌঁছামাত্র সারা মক্কায় রব পড়ে গেল। আবু জাহ্ল তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেল। অতঃপর অন্যদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। সে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলল–
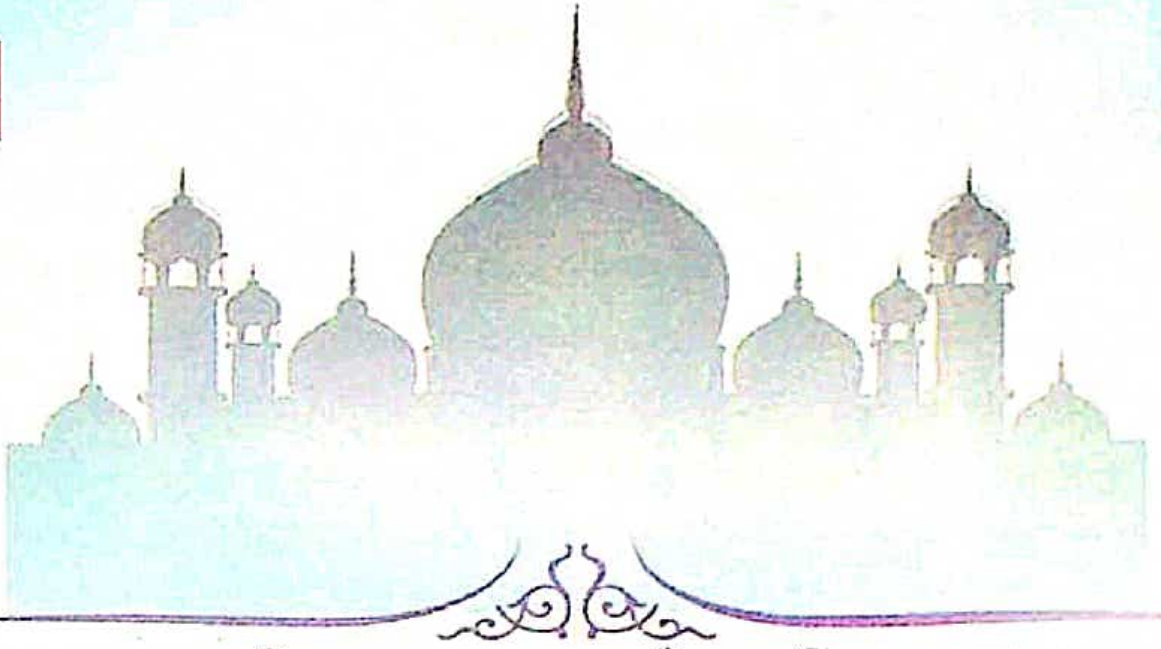
তোমরা বের হও! নিজেদের কাফেলাকে বাঁচাও! নিজেদের মালামাল ও ধন-সম্পদ রক্ষা কর!

মক্কাবাসী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। কেউ তলোয়ার ধার দিতে লেগে গেল। কেউ তীর সোজা করতে বসে গেল। আবার কেউ বা তার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামানাদি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বহু মুশরিক তাদের ঘোড়ায় জিন বেঁধে নিজে মরতে ও অন্যদের মারতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেল। একমাত্র উমাইয়া ইবলে খাল্‌ফই ছিল ব্যতিক্রম। সে ছিল সম্পূর্ণ নীরব ও লোকচক্ষুর অন্তরালে। সে চোখের সামনে তার মৃত্যুকে ভাসতে দেখছিল। তাই সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাবার পিছনে লুকিয়ে পড়ল।

অপরদিকে আবু জাহ্‌ল জানতে পারল যে, উমাইয়া যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য বাহানা তালাশ করছে। তাই আবু জাহ্‌ল তৎক্ষণাৎ তার কাছে গিয়ে তাকে রাজি করানোর জন্য বলল, আবু সফ্‌ওয়ান! তুমি মক্কাবাসীদের সরদার। লোকজন যখন যুদ্ধের ময়দানে তোমাকে অনুপস্থিত দেখবে, তখন তাদের পা-ও নড়বড়ে হয়ে যাবে।

আবু জাহ্‌লের কথা উমাইয়ার মধ্যে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। সে খুব ভালোভাবেই জানত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।

তার মনে বারবার ঘুরেফিরে এ কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বলে দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে

হত্যা করে ফেলবেন, তখন আসমান ভেঙ্গে পড়তে পারে, জমিন বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে, সমস্ত জগতের নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমি কিছুতেই জীবিত ফিরে আসতে পারব না।

আবু জাহ্ল ছিল ইতর, অভদ্র, নীচ ও ছোটলোক। পাশাপাশি সে ছিল খুবই ধূর্ত ও চালাক। সে তৎক্ষণাৎ এমন কোনো পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে শুরু করল, যার মাধ্যমে উমাইয়াকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা যেতে পারে।

সে একটি সুগন্ধি-পাত্র জোগার করল। তাতে জ্বলন্ত 'উদ' [এক ধরনের কাঠ, যা আগুনে জ্বালালে সুগন্ধি ছড়ায়।] রাখা হল। আবু জাহ্ল ওই সুগন্ধি-পাত্র নিয়ে উমাইয়ার নিকট গেল। উমাইয়া তখন কাবা ঘরের ছায়ায় নিজ কওমের লোকদের সঙ্গে কথা বলছিল। চতুর আবু জাহ্ল উমাইয়াকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বলল, আবু সফ্ওয়ান! এই নাও সুগন্ধি! গায়ে মেখে নাও! তুমি তো পুরুষ নও। তুমি তো একজন কোমলমতী লজ্জাবতী নারী। যুদ্ধের নাম শুনে তোমার কলিজা শুকিয়ে গেছে। তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। দুশমনের মুখোমুখী হওয়ার হিম্মত তোমার নেই। অতএব, তুমি যাও! গিয়ে নারীদের সঙ্গে মুখ লুকিয়ে ঘরে বসে থাক। তোমার স্থানে আমরাই লড়াই করব। আরে! নারী হবে তো পুরোপুরি নারী হয়ে যাও। নারীরা যেভাবে সুগন্ধি লাগিয়ে সাজসজ্জা গ্রহণ করে পরিপাটি হয়ে থাকে, তুমিও সুগন্ধি লাগিয়ে সেজেগুঁজে তাদের সঙ্গেই ঘরে বসে থাক।

আবু জাহ্ল ছিল অনেক বড় ধোঁকাবাজ, ধূর্ত ও চালাক।

সে জানত কীভাবে মানুষের স্পর্শকাতর জায়গায় নাড়া দিতে হয়। আবু জাহ্লের কথাগুলো শোনামাত্রই উমাইয়ার আত্মমর্যাদাবোধ উথলে ওঠল। উমাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে বলে ওঠল, শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে বাধ্য করলেই। আল্লাহর কসম! আমি এমন দ্রুতগামী উটে চড়ে যুদ্ধে যাব, যার মতো দ্রুতগামী উট পুরো মক্কায় আর দ্বিতীয়টি নেই। এ বলেই সে দাঁড়িয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, উম্মে সফ্ওয়ান! আমাকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত করে দাও।

স্ত্রী বলল, তুমি কি তোমার ইয়াসরিবী [মদীনাবাসী] বন্ধুর কথা ভুলে গেছ?

উমাইয়া বলল, না, আমি সে কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি। মক্কাবাসীদের সঙ্গে আমি লড়াইয়ের ময়দানে যাচ্ছি না। আমি তো কেবল লোকদেখানোর জন্য কিছুদূর পথ অতিক্রম করব। অতঃপর সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসব।

বাস্তবেও উমাইয়া এমনটিই করতে চেয়েছিল। সে কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে বের হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পথে বাহিনী যেখানেই খাওয়া-দাওয়া কিংবা বিশ্রামের জন্য ছাউনি ফেলত, সেখানেই উমাইয়া তার উটকে কিছুটা দূরত্বে বাঁধত। যাতে সুযোগ পেলেই পালিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আবু জাহ্‌ল তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখত। কোথাও একা যেতে দিত না। তার দৃষ্টি সবসময় উমাইয়াকেই পাহারা দিত। আবু জাহ্‌লের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উমাইয়া যখনই সুযোগ পাবে, তখনই সে উধাও হয়ে যাবে।

কুরাইশ বাহিনী লক্ষ্য পানে এগিয়ে চলল। উমাইয়া শত চেষ্টা করেও পলায়নের কোনো পথ করতে পারল না। অবশেষে একদিন মুশরিক বাহিনী বদর প্রান্তরে গিয়ে উপনীত হল এবং হক-বাতিলের সেই প্রথম লড়াইয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক উমাইয়া নিহত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হল।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩২, ৩৯৫০]

(৫)

হত্যাকারীরূপে এসেছিল অনুগত হয়ে ফিরে গেল
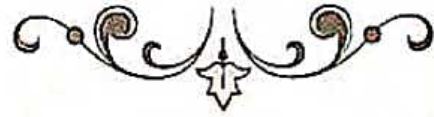
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো এমনও ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতেন, যা তাঁর থেকে বহু দূরে প্রকাশিত হত। উদাহরণস্বরূপ, দূর মক্কায় কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে কিংবা সুদূর পারস্যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বসেই সাহাবায়ে কেরামকে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে এই–

বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে এসেছে। তাদের সত্তর জন বড় বড় নেতা জাহান্নামে পৌঁছেছে। আরও সত্তর জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছে। কুরাইশের জন্য এ ঘটনা ছিল চরম লাঞ্ছনা ও দুঃসহ্য এক যন্ত্রণা।

উমাইর ইবনে ওয়াহ্‌ব ঘুরতে ঘুরতে কাবার কাছে এসে পৌছল। কাবার ছায়ায় হাজরে আসওয়াদের পাশে সে সফ্‌ওয়ান ইবনে উমাইয়ার দেখা পেল। উমাইর তার কাছে গিয়ে বসল। দু'জনই বিভিন্ন কথাবার্তা ও সুখ-দুঃখের আলোচনা শুরু করল। উভয়েই ছিল বেদনাক্লিষ্ট। উমাইরের ছেলে মুসলমানদের হাতে বন্দী ছিল আর সফ্‌ওয়ানের বাপ উমাইয়া বদরে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল।

সফ্ওয়ান বলল, আল্লাহর পানাহ্! বদরের ঘটনা ও সেখানকার নিহতদের পর জীবনটাই একদম দুর্বিসহ হয়ে ওঠেছে!

উমাইর বলল, হাঁ দোস্ত! তুমি ঠিকই বলেছ। তাদের পর বেঁচে থাকার আর কোনো স্বাদই অবশিষ্ট নেই। আফসোস! আমার কাঁধে অনেক ঋণের বোঝা। তা পরিশোধ করার মতো সামর্থ্যও আমার নেই। পরিবার চালানোর মতো তেমন কোনো অবলম্বনও আমার নেই। আমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে পরিবারের সদস্যরা না খেয়ে মরবে। হায়! আমার যদি এমন সকীর্ণ ও করুণ অবস্থা না হত, তা হলে আমি উড়ে গিয়ে মদীনায় পৌঁছতাম এবং মুহাম্মাদের দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দিতাম। ওহে ভাই সফ্ওয়ান! তুমি তো অনেক বড় ধনী; অনেক ধন-সম্পদ তোমার! তুমি যদি আমার এ সকল যিম্মাদারী গ্রহণ করতে, তা হলে আমি নিশ্চিন্তে মদীনায় যেতে পারতাম। যাওয়ার একটি বাহানাও আমার আছে।

সফ্ওয়ান বলল, কী বাহানা?

উমাইর বলল, আমার ছেলে মুসলমানদের হাতে বন্দী। আমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে আমার মোকদ্দমা পেশ করব। তার কাছে আর্জি পেশ করে বলব– আমার ছেলে আপনার হাতে বন্দী। আমি মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।

উমাইরের কথা শুনে সফ্ওয়ান চঞ্চল হয়ে ওঠল। মনে মনে ভাবে লাগল, প্রতিশোধ গ্রহণের এই তো সুবর্ণ সুযোগ! সে তৎক্ষণাৎ উমাইরকে নিশ্চিত করল যে, তুমি কোনো চিন্তা করো না। তোমার সমস্ত ঋণ আমি পরিশোধ করে দিব। বাকি থাকল তোমার সন্তানাদির কথা। তাদেরকেও আমি নিজের ছেলেমেয়ে মনে লালন-পালন করব। তুমি নিশ্চিন্তে মদীনায় চলে যাও এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নাম-নিশানা মিটিয়ে দাও।

উমাইর বুঝতে পারল, সে কথা বলে ফেঁসে গেছে। নিজেই নিজেকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করেছে। এখন ফিরে আসাও সম্ভব নয়। অপরদিকে সফ্ওয়ানও এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না।

তাই সে কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ উমাইরের সওয়ারীর ব্যবস্থা করল এবং বিষমিশ্রিত একটি তলোয়ারও তার হাতে ধরিয়ে দিল।

উমাইর তার পরিবার-পরিজনকে বিদায় জানিয়ে মদীনার পথে রওয়না হয়ে পড়ল। পথিমধ্যে সে বারবার ফিরে ফিরে স্বদেশ-ভূমির ঘরবাড়ি ও পাহাড়-পর্বতগুলো দেখছিল। অবশেষে একদিন সে মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। অতঃপর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে মসজিদে নববীর পথ ধরল। মসজিদের সামনে গিয়ে সওয়ারী থেকে নামল। সওয়ারী বাঁধল। নিজের কোষমুক্ত তরবারী গলায় ঝুলাল। মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। হঠাৎ হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার উপর। দেখামাত্র উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে বলে ওঠলেন, আরে! একে দেখ! আল্লাহর দুশমন! এ সেই লোক, যে বদরের দিন কুরাইশকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল।

এই বলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু দ্রুতবেগে তার দিকে ধাবিত হলেন, যাতে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। কিন্তু তিনি তার নাগাল পাওয়ার আগেই সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উমাইরের হীন উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কথার মারপ্যাঁচে ফেলে সামলে ওঠার আগেই তলোয়ারের আঘাতে জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিবে।

কতটা নির্বোধ ছিল এ লোক! পরিণতি সম্পর্কে কতটাই না বে-খবর ছিল!!

সে মনে করছিল এমন একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ খুব সহজেই করে ফেলবে সে! কিন্তু তার কি জানা ছিল, কুদরত তার তাকদীরে কী লিখে রেখেছেন?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি ওঠালেন। উমাইরের দিকে তাকালেন। তারপর তার তলোয়াদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, উমাইর! কী উদ্দেশ্যে এসেছ?

উমাইর এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিল, আমার ছেলে তোমাদের হাতে বন্দী। তার মুক্তিপণ দিতে এবং তাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। তোমরা তো খুব আনন্দ ও সুখে আছ! তোমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন, ভাইবোন, বিবি-বাচ্চা সকলেই তোমাদের চোখের সামনে। কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে তোমরা আমাদের দৃষ্টির আড়াল করে দিয়েছ। এতে তোমাদের কী লাভ? উত্তম হয়, তোমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করে আমাদের বন্দীদের ছেড়ে দাও।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কয়েদি ছাড়াতে আসে, তার গলায় তো মালামাল ও ধন-দৌলতের বোঝা ঝোলানো থাকার কথা, কিন্তু তোমার গলায় তো দেখছি কোষমুক্ত তরবারী চমকাচ্ছে! আখেরে এর উদ্দেশ্য কী?

উমাইর চালাকি করে বলল, আল্লাহ এই তলোয়ারকে লাঞ্ছিত করুন! বদরের দিন আমাদের তলোয়ারসমূহ বেকার হয়ে গেছে। এগুলো আমাদের কোনোই উপকার করতে পারেনি। আমি খুব তাড়াহুড়া করে উট থেকে নেমেছি, তাই তলোয়ারের কথা খেয়াল ছিল না। এর কথা আমি একদম ভুলে গেছি। তাই এটি এভাবেই ঝুলন্ত রয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উমাইর! সত্য করে বলে ফেল কেন এসেছ?

উমাইর বলল, আমি শুধু আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। এ ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উমাইর! হাজরে আসওয়াদের পাশে সফ্ওয়ান ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে কী কী শর্ত করে এসেছ, তারও কিছুটা আমাদের শোনাও!

উমাইরের গা কাঁটা দিয়ে ওঠল। তার সারা শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল। সে আতঙ্কিত হয়ে বলল, আমি... আমি... আমি... কী শর্ত করে এসেছি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি আমাকে হত্যা করার বিনিময়ে তার কাছ থেকে তোমার পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার গ্রহণ ও তোমার ঋণসমূহ পরিশোধ করে দেওয়ার জামানত গ্রহণ করেছ। কিন্তু তোমার এই অসৎ উদ্দেশ্যের পথে আল্লাহ তাআলা প্রতিবন্ধক হয়ে গেলেন এবং তুমি অকৃতকার্য হয়ে গেলে।

উমাইর বজ্রের ন্যায় এক ঝাঁকুনি খেল। সে কাঁপতে শুরু করল এবং এই ভেবে একদম হতভম্ব হয়ে গেল যে, মক্কায় আমার ও সফ্ওয়ানের মাঝে যে কথা ও চুক্তি হয়েছিল, তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানল কীভাবে? তারপর সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠল–

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এতদিন পর্যন্ত আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আস-ছিলাম এবং এই ভুল ধারণায় ডুবে ছিলাম যে, ওহী এবং আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশ্তার সমস্ত কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। কিন্তু এ চুক্তি তো কেবল আমার ও সফ্ওয়ানের মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল। সেখানে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

নিঃসন্দেহে আমাদের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী ও সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান মহান আল্লাহই অবগত করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করতে পারে না।

উমাইর তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীতে পরিণত হয়ে গেলেন।

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত সত্য হওয়ার সুস্পষ্ট একটি নিদর্শন; যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন-কারী উমাইর নিজেই রাসূলুল্লাহর সত্যবাদীতার তলোয়ারে ঘায়েল হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করলেন।

[আল-মাগাযী লি মুসা ইবনে উকবাহ : ১/৪৬]
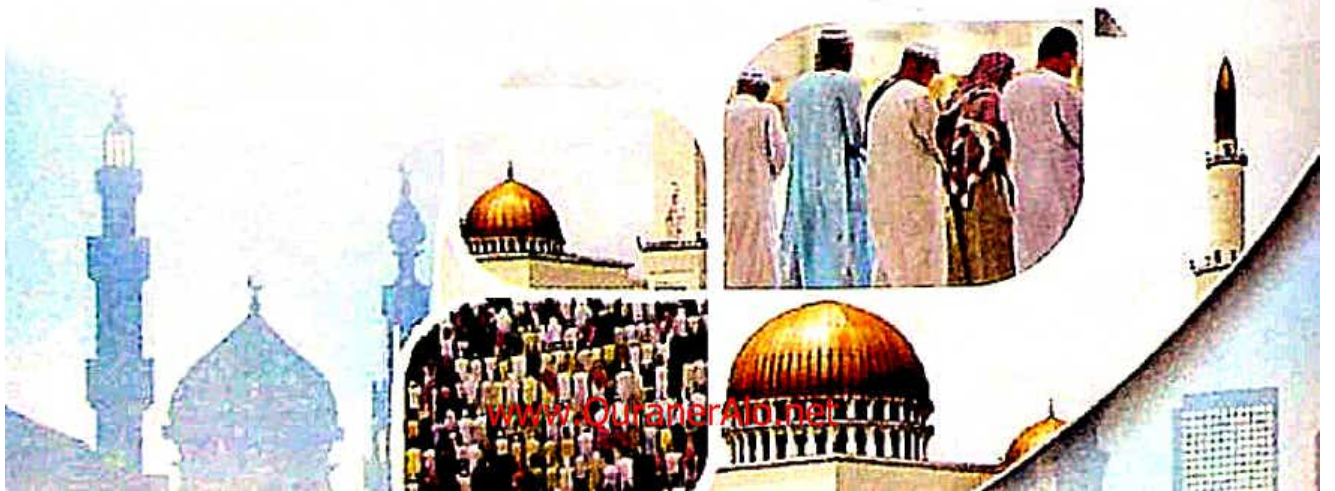
(৬)
বিষ খাওয়ানোর ঘৃণ্য চেষ্টা

খাইবারের ঘটনা। খাইবারে মুসলমান ও ইহুদীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা ইহুদীদেরকে ঘেরাও করে নেয়। দীর্ঘদিন যাবত এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইহুদীরা নতি স্বীকার করে এবং পরাজয় মেনে নেয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীবেশে খাইবারে প্রবেশ করেন।

কিন্তু হিংসা ও শত্রুতাবশত এক ইহুদী নারী যাইনাব বিনতে হারেস নবীজীর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করে। সে একটি বকরি রান্না করে তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। অতঃপর সে মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এ তথ্যও জেনে নেয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির বাহুর খুব পছন্দ করেন। তাই সে বাহুর অংশে বেশি করে বিষ মেশায়। অতঃপর তা নিয়ে নবীজীর খেদমতে হাজির হয়।

নবীজী ও সাহাবায়ে কেরামের সামনে খাবার রেখে সে বলল, আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য এ সামান্য হাদিয়া।

সাহাবায়ে কেরাম খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। নবীজীও বাহুর একটি টুকরা নিয়ে মুখে দিলেন। সামান্য পরিমাণ খেয়েই তিনি বলে ওঠলেন, তোমরা কেউ এ গোশ্ত খেয়ো না। সকলে হাত উঠিয়ে নাও।

সাহাবায়ে কেরাম অবাক হলেন। সকলেই হাত গুটিয়ে নিলেন। ভাবতে লাগলেন, কী হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখানে যত ইহুদী আছে, তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারা সবাই এল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, তোমরা কি এর সঠিক উত্তর দিবে? তারা বলল, জি, হাঁ। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পূর্বপুরুষ কে? তারা বলল, আমাদের পুর্বপুরুষ অমুক ব্যক্তি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ! তোমাদের পূর্বপুরুষের নাম তো অমুক। তারা স্বীকার করে নিয়ে বলল, জি হাঁ! আপনি সত্য বলেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে? তারা বলল, জি হাঁ! [কেননা] আমরা যদি মিথ্যা বলি, তা হলে তো আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পূর্বপুরুষ সংক্রান্ত মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।

নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, জাহান্নামী কারা? তারা জওয়াব দিল, আমরা [ইহুদীরা] অল্প কিছুদিন জাহান্নামে থাকব। তারপর জান্নাতে চলে যাব। আমাদের পর আপনারা [মুসলমানরা] জাহান্নামে আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরাই জাহান্নামে লাঞ্ছনা ভোগ করতে থাকবে। আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই জাহান্নামে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তা হলে কি তোমরা সঠিক উত্তর দিবে?

তারা বলল, জি হাঁ!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এ গোশ্‌তে বিষ মিশিয়েছ?

তারা উত্তর দিল, জি হাঁ।

নবীজী জিজ্ঞাসা, কেন? কোন জিনিস তোমাদেরকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে?

তারা জওয়াব দিল, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল– যদি আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, তা হলে [এই মাধ্যমে] আমরা আপনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাব। আর যদি আপনি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী হয়ে থাকেন, তা হলে এই বিষ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আপনি বলুন যে, বিষের খবর আপনি জানলেন কীভাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোশ্তের সেই টুকরাটি উঠিয়ে বললেন, এ আমাকে বলেছে যে, তোমরা এতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছ।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৭৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৫১০]

আমি কুরবান হই সেই মহান সত্তার উপর; আমার রবের অসংখ্য অগণিত রহমত ও বরকত নাযিল হোক তাঁর উপর। মহান রব্বুল আলামীন বকরীর গোশ্তের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন যে– আমার মনিব! এই গাদ্দার জালিমরা আপনাকে হত্যা করার জন্য আমার সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

(৭)
আমার রব তোমাদের রবকে হত্যা করে ফেলেছেন

পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পৌঁছে দিলেন।

কিসরা ছিল তৎকালীন পৃথিবীর দুর্দান্ত ক্ষমতার অধিকারী ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক সম্রাট। পুরো পারস্য, ইরান, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান এবং বর্তমান পাকিস্তানের বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার সুবিশাল সাম্রাজ্য। এত বড় ক্ষমতার অধিকারী অহংকারী সম্রাট নবীজীর চিঠি পড়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল। সে নবীজীর চিঠিটিকে তাচ্ছিল্যভরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। বলল–

[তার এত বড় সাহস!] আমার গোলাম হয়ে সে এমন একটি চিঠি লিখতে পারল! আমার নামের আগে তার নিজের নাম লিখল!

কিসরা অত্যন্ত অহংকারী, আত্মম্ভরি ও উদ্ধতচারী ছিল। সে নবীজীর চিঠিটিকে টুকরো টুকরো করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সে ইয়ামানের গভর্নর বাযান এর নিকট তৎক্ষণাৎ এই ফরমান লিখে পাঠাল যে–:

আমি অবগত হয়েছি যে, তোমার এলাকায় এক লোক নবী হওয়ার দাবি করেছে। অতিসত্বর তুমি তার নিকট দু'জন শক্তিশালী যুবককে পাঠাও। তারা যেন তাকে শিকলে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসে।
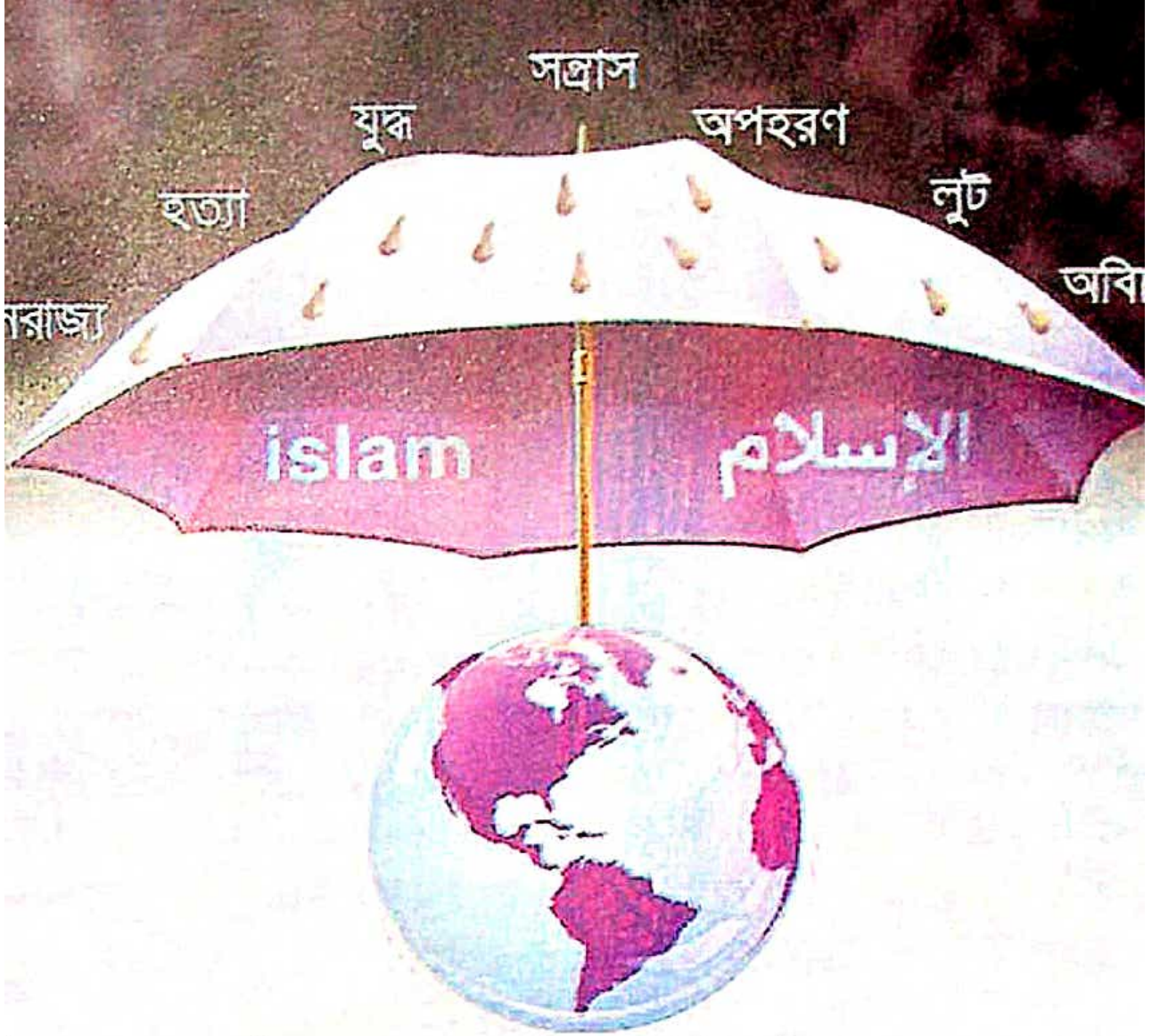
ইয়ামানের গভর্নর বাযান তৎক্ষণাৎ দু'জন শক্তিশালী ও বাহাদুর যুবককে পাঠিয়ে দিল। উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা শিকলে বেঁধে নিয়ে আসবে।

বাহাদুর যুবকদ্বয় রওয়ানা হয়ে গেল। মদীনায় পৌঁছেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হল। অতঃপর কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়াই বলতে শুরু করল– 'ওঠো! আমাদের সাথে চলো! যদি যেতে অস্বীকার কর, তা হলে কিসরা তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তোমাদের পুরো শহর তছনছ করে ফেলবে। তোমাদের চিহ্নটুকুও আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি তুলে তাদের দিকে তাকালেন। তাদের মুখে দাড়ি ছিল না; গোঁফ ছিল লম্বা লম্বা। নবীজী তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। তাদের দিকে তাকানোও ভালো মনে করলেন না। অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন–

وَيْلَكُمَا! مَنْ أَمَرَكُمَا بِهٰذَا؟

তোমরা ধ্বংস হও! [দাড়ি মুণ্ডনের] এ আদেশ তোমাদেরকে কে দিয়েছে? তারা উত্তর দিল, আমাদের প্রভু কিসরা আমাদের এ আদেশ দিয়েছেন, যেন আমরা দাড়ি মুণ্ডন করি এবং গোঁফ বড় রাখি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

لَكِنَّ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِيْ وَبِقَصِّ شَارِبِيْ .

কিন্তু আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, যেন আমি আমার দাড়ি লম্বা করি এবং গোঁফ কেটে রাখি।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে তাদেরকে বললেন– 'তোমরা আজ চলে যাও! কাল এসো।' তারা চলে গেল। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহী নাযিল হল যে, আল্লাহ তাআলা কিসরার ছেলে শিরওয়াকে কিসরার উপর চড়াও করে দিয়েছেন। ছেলে তার পিতার উপর হামলা করে পিতাকে মৃত্যুর দুয়ার পাড় করে দিয়েছে।

পরের দিন যখন ওই বাহাদুর যুবকদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধরে নিতে এল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমার রব তোমাদের মিথ্যা প্রভুর অহংকার, ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা এবং সত্য-প্রত্যাখ্যান করাকে পছন্দ করেননি। তাই কিসরার উপর তার ক্রোধ ও গজব পতিত হয়েছে এবং তিনি তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার কৃতকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। কিসরার কর্তিত গর্দান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।

নবীজীর মুখে এ কথাগুলো তাদের কাছে আস্পর্ধা বলে মনে হচ্ছিল। কিসরার ধ্বংসের কথা তারা ভাবতেই পারছিল না। তারা বলতে লাগল, তুমি জান, তুমি কী বলছ? আমরা এখনই যাচ্ছি। তোমার এ কথা বাযানকে জানাচ্ছি। তারপর দেখো তোমার পরিণতি কী হয়?
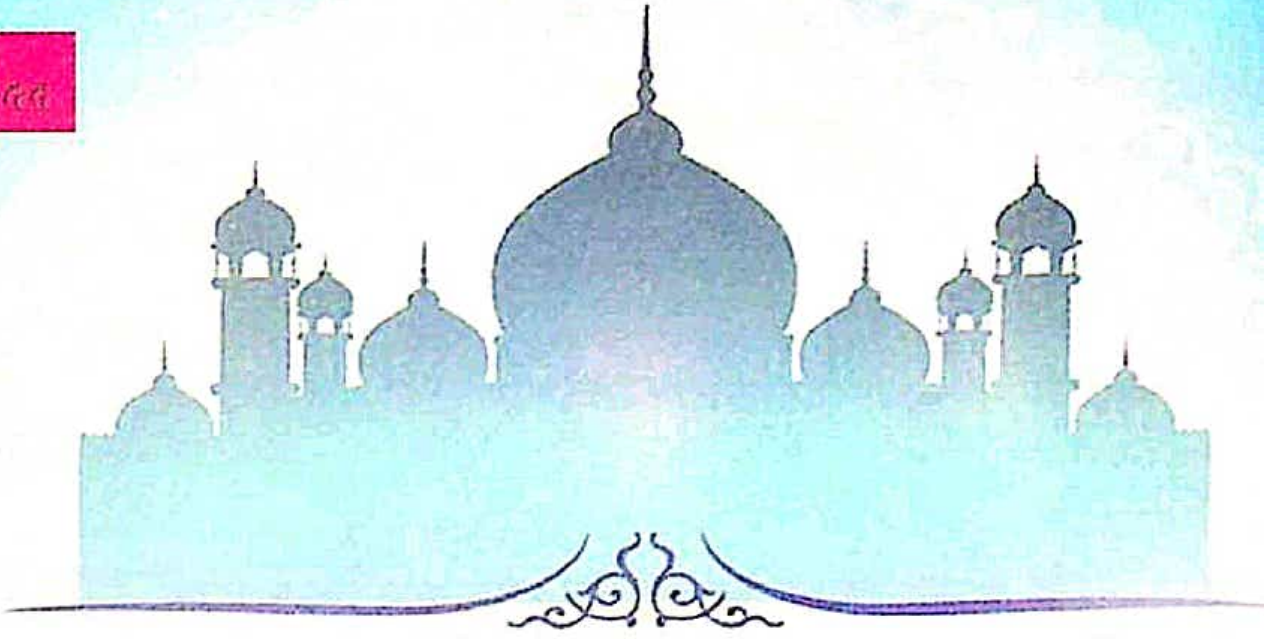
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, হাঁ হাঁ! যাও! তাকে আমার নাম বলে বলো এবং সতর্ক করে দিয়ো– নিঃসন্দেহে আমার দ্বীন ও রাজত্ব কিসরার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যাবে। বরং পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় কোনায় পৌছে যাবে। তাকে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তাও পৌছে দিয়ো– 'যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তা হলে তোমার সাম্রাজ্য তোমারই দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাকে তোমার কওমের বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হবে।' বাহাদুর যুবকদ্বয় ফিরে চলল। বাযান এর নিকট পৌছে তারা পুরো ঘটনা খুলে বলল। সুদীর্ঘ পথের দূরত্বের কারণে পারস্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ তখনও বাযানের নিকট এসে পৌছোয়নি।

ঘটনার বিবরণ শুনেই বাযান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে ওঠল, আল্লাহর কসম! এ কোনো বাদশাহর কথা নয়। আমার মন বলছে ওই ব্যক্তি তার দাবি মোতাবেক সত্য নবী। যাহোক, খুব শীঘ্রই তার সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে। যদি কিসরার ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত সংবাদ জানতে পারি, তা হলে তার অর্থ হবে মদীনার নবীর কথা সত্য এবং তিনি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। আর যদি তার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তা হলে তার ব্যাপারে আমরা পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

বাযান তখনও তার কথা শেষ করতে পারেনি, এরই মধ্যে কিসরার ছেলে শিরওয়ার চিঠি এসে পৌছল তার কাছে। চিঠিতে সে লিখেছে– 'এখন থেকে আমিই পারস্য সম্প্রাট। আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি নির্দেশ হচ্ছে আমার বশ্যতা স্বীকার করে নাও এবং আমার অধীন হয়ে কাজ কর।'

ওই চিঠিতে কিসরা নিহত হওয়ার সময়ও উল্লেখ ছিল। বাযান তা মিলিয়ে দেখল সময়টা ছিল ঠিক সেই সময়, যে সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহাদুর যুবকদ্বয়কে সংবাদ দিয়েছিলেন।

বাযানের নিকট যখন এ সত্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন সে উচ্চস্বরে বলে ওঠল– 'নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য রসূল।' অতঃপর বাযান ও ইয়ামানবাসী সকলেই পারস্য সম্রাট থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহমুখী হয়ে গেল এবং সকলেই মুসলমান হয়ে গেল।

[আস-সীরাত লি ইবনে হিশাম : ১/৬৮-৭০, আস-সীরাতুন নববিয়্যা লি ইবনে কাসীর ৩/৫০৯]

(৮)

সালাম তোমায়... হে খুবাইব!

উহুদ যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবীলায়ে আয্‌ল ও ক্বার্‌রা'র বাসিন্দাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের সাথে আপনার কিছু সাহাবীকে পাঠিয়ে দিন, যাতে তারা আমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে পারেন, কুরআন পড়াতে পারেন এবং আমাদেরকে ইসলামী শরীয়তের সাথে পরিচিত করে তুলতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীকে নির্বাচন করে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে। তাঁরা হলেন–

১. হযরত মারছাদ ইবনে আবী মারছাদ গানাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু।
২. হযরত খালেদ ইবনে বুকাইর লাইছী রাযিয়াল্লাহু আনহু।
৩. হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু।
৪. হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু।
৫. হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা রাযিয়াল্লাহু আনহু।
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(সহীহ বুখারীর রেওয়াতে দশ জনের কথা বর্ণিত আছে। তবে বাকি চারজনের নাম অজানা।)
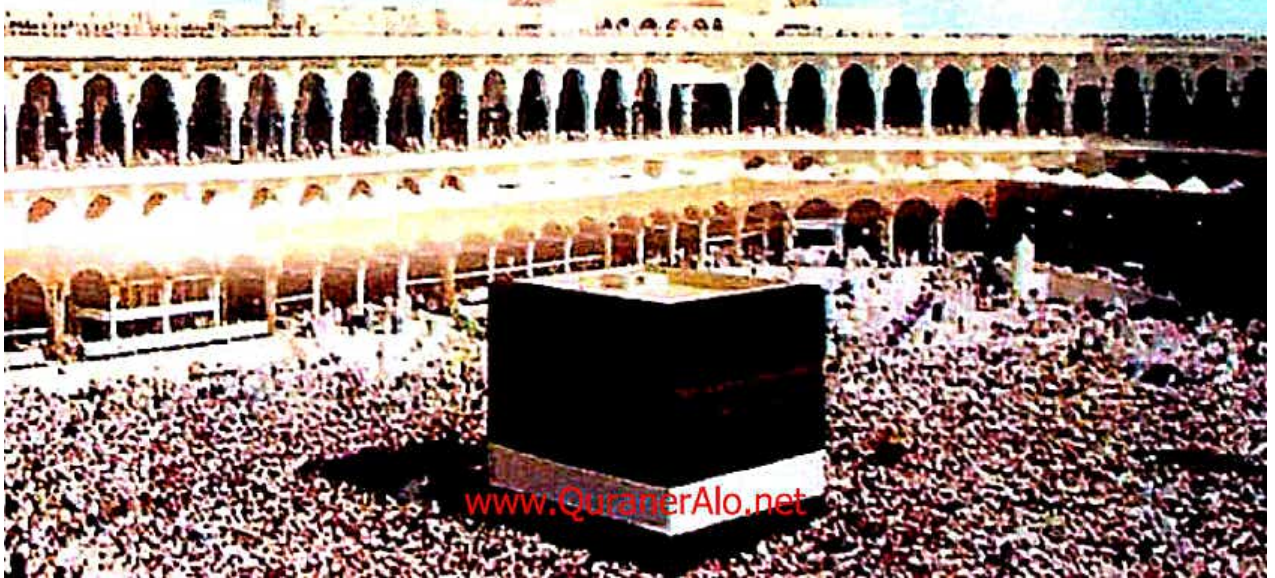
উল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম তাদের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কাফেরদের গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করলেন। কাফের-গোত্রসমূহের দৃষ্টি এড়িয়ে সফর অব্যাহত রাখলেন। এক সময় তাঁরা হুযাইল গোত্রের নিকটবর্তী রজী' নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সাবধানতা ও সতর্কতা সত্ত্বেও হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ হুযাইল গোত্রের একশ' ঘোড়সওয়ার তাদের পিছনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। হুযাইলের লোকেরা তাঁদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে পথ এগুতে লাগল। এক সময় তারা সেই জায়গায় পৌঁছে গেল, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করেছিলেন। হুযাইলের লোকেরা সেখানে পৌঁছে খেজুরের বিচি দেখতে পেল। সাহাবায়ে কেরাম পাথেয়স্বরূপ মদীনা থেকে খেজুর নিয়ে এসেছিলেন। খেজুরের বিচি দেখে ঘোড়সওয়াররা চিৎকার দিয়ে ওঠল– এই দেখ! এ তো ইয়াসরিবেরই [মদীনারই] খেজুর!

এবার তারা আরও দ্রুত গতিতে তাঁদের পিছনে ধাওয়া করতে শুরু করল। চলতে চলতে এক সময় তারা সাহাবায়ে কেরামের একদম নিকটে পৌঁছে গেল এবং পৌঁছেই তাঁদের উপর আক্রমণ করে বসল।

সাহাবায়ে কেরাম এই আকস্মিক হামলা থেকে আত্মরক্ষার্থে দৌড়ে একটি ছোট পাহাড়ের উপর আরোহরণ করলেন। হামলাকারীরা চতুর্দিক থেকে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং পাহাড়ে চড়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তারা সফল হতে পারল না। পাহাড়ে চড়তে ব্যর্থ হল।

যখন বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পাহাড়ের কঠিন ও দূরাতিক্রম্য পথে তাদের পা স্থির করতে পারল না, তখন তারা নীচে নেমে এসে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল– আমরা তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি! তোমরা নীচে নেমে এলে আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না।

হযরত আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কথার জওয়াবে বললেন, আমি কোনো কাফেরের উপর কখনোই ভরসা করতে পারি না।

অতএব, আমি নীচে নামব না। এ বলে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন– 'হে আল্লাহ! আমাদের এ অবস্থা সম্পর্কে আপনার হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করে দিন।'

এরপর হামলাকারীরা সাহাবায়ে কেরামের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। এক পর্যায়ে তীরের আঘাতে আঘাতে হযরত আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর দুই সঙ্গী শহীদ হয়ে গেলেন। বাকি রয়ে গেলেন হযরত খুবাইব ইবনে আদী, যায়েদ ইবনে দাছিনা ও আবদুল্লাহ ইবনে তারেক রাযিয়াল্লাহু আনহুম। হামলাকারীরা তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলল, আমরা তোমাদেরকে পাকা ওয়াদা দিচ্ছি! তোমারা নিজেদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দাও, আমরা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করব না।

অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম তাদের কথায় ভরসা করে নীচে নেমে এলেন। যখন তাঁরা তাদের হাতের নাগালে এসে পড়লেন, তখনই তারা ধনুকের রশি খুলে সাহাবায়ে কেরামকে বেঁধে ফেলল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তোমাদের প্রথম ধোঁকা! এ বলেই তিনি রশি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন এবং নিজের তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক ও শক্তিশালী ছিলেন। কাপুরুষ হামলাকারীরা তাঁর কাছে আসতেই সাহস করতে পারল না। দূর থেকেই তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করতে শুরু করল। অনবরত পাথরবর্ষণের ফলে এক পর্যায়ে গুরুতর জখম হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে তারেক রাযিয়াল্লাহু আনহুও শাহাদাত বরণ করেন।

তারপর এই গাদ্দার ধোঁকাবাজ হামলাকারীরা হযরত খুবাইব ও যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং মক্কার বাজারে তাঁদেরকে বিক্রি করে দিল।

হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হারেস ইবনে আমেরের ছেলেরা ক্রয় করে নিল। কারণ, খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে তাদের পিতা হারেসকে হত্যা করেছিলেন। আর হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কিনে নিল সফ্ওয়ান ইবনে উমাইয়া। সফ্ওয়ান তার পিতা উমাইয়ার হত্যার বদলায় হত্যা করার জন্য তাঁকে কিনে নিয়ে গেল। উমাইয়াকেও মুসলমানগণ বদরের যুদ্ধে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন।

সফ্ওয়ান হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য তার গোলাম নিস্তাস এর হাতে সোপর্দ করে দিল। নিস্তাস তাঁকে নিয়ে মক্কার বাইরে চলে গেল। তাঁর মৃত্যুর তামাশা দেখার জন্য কুরাইশের লোকজন তাঁর আশপাশে জমা হয়ে গেল। তাদের মধ্যে আবু সুফ্য়ান ইবনে হার্বও ছিল। সে হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রশিতে বাঁধা অবস্থায় দেখে বলল– কয়েক মুহূর্ত পরই নিস্তাসের তলোয়ার তোমার গর্দান দেহ থেকে আলাদা করে দিবে। যায়েদ! তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি! সত্য সত্য বল, তুমি কি মনে মনে এ কথা ভাবছ না যে, আহ্! যদি আজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার জায়গায় হত, আমরা তোমার বদলে তার গর্দানে তলোয়ার চালিয়ে দিতাম, আর তুমি নিশ্চিন্তে-নিরাপদে ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী-পরিজনের সাথে জীবন যাপন করতে! এমন হলে তোমার কতই না আনন্দ হত!

হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু অস্থির হয়ে বলে ওঠলেন, হতভাগা! এ তুমি কী বলছ? আল্লাহর কসম! আমি তো এটাও পছন্দ করি না যে, আমার জানের বিনিময়ে আমার মনিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে সামান্য একটি কাঁটাও ফুটুক! তাঁর বিন্দুমাত্রও কষ্ট হোক!

আবু সুফ্য়ান নিজের অজান্তেই চিৎকার দিয়ে বলে ওঠল, আল্লাহর কসম! আমি আজ পর্যন্ত খোদার জমিনে কেউ কাউকে এত বেশি ভালোবাসতে দেখিনি! যতটা ভালোবাসে মুসলমানরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে। এরপর নিস্‌তাস হযরত যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দিল।

অপরদিকে হযরত খুবাইব ইবনে আদী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কাফেররা কিছুদিন তাদের কাছে বন্দী করে রাখল। এ সময়ে তারা হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বড় আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা দেখল।

হারেসের মেয়ে যাইনাবের ভাষ্য– আমার ভাইয়েরা খুবাইবকে আমার ঘরে বন্দি করে রেখেছিল। একদিন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখছিলাম। আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলাম। দেখলাম, তার হাতে একটি আঙ্গুরের থোকা। আঙ্গুরগুলি এত বড় বড় যে, একেকটি আঙ্গুর মানুষের মাথার সমান। সে ওগুলো নিশ্চিন্ত ও শান্তভাবে খাচ্ছে। অথচ ওই মৌসুমে মক্কার কোথাও এ ফল পাওয়া যেত না। আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁকেই দান করেছেন।

যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন সে আমাকে বলল– আমাকে একটি ক্ষুর দাও। যাতে নিহত হওয়ার পূর্বে আমার শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পবিত্র হতে পারি।

সে তার শরীরের অবাঞ্ছিত পশম পরিষ্কার করতে চাচ্ছিল। আমি তাকে ধারালো একটি ক্ষুর দিলাম। অতঃপর আমি আমার নিজের কাজে মনোযোগী হয়ে গেলাম। আমি বলতেই পারব না কোন ফাঁকে আমার বাচ্চা ঘুরতে ঘুরতে তার কাছে চলে গেল।

সে আমার বাচ্চার হাত ধরে কাছে নিয়ে নিজের কোলো তুলে বসাল। যখনই এ দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, আমি ভয়ংকররূপে আঁতকে ওঠলাম। হায়! এ আমি কী করলাম? আল্লাহর কসম! এ লোক তো রাগে-ক্ষেভে এ ধারালো ক্ষুর দিয়ে আমার বাচ্চাকে জবাই করে ফেলবে! সে তো নিশ্চিতরূপে জানে তার মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর পূর্বে না সে নিজের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ফেলে!

আমার ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে খুবাইব বুঝতে পারল আমি ভয় পেয়েছি। ক্ষুর তখনও তার হাতেই ছিল। সে বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি কি মনে করছ আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? ইনশাআল্লাহ আমি কখনোই এমনটি করব না। আমি ধোঁকাবাজ নই; প্রতারক নই। এটুকু বলে সে আমার বাচ্চাকে ছেড়ে দিল। আমি খুবাইবের চেয়ে উত্তম কয়েদি জীবনে আর কখনোও দেখিনি।

একদিন তারা খুবাইবকে শূলে চড়ানোর জন্য নিয়ে গেল। খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি অনুমতি দাও, তা হলে আমি দুই রাকাত নামায পড়তে চাই? তারা বলল, যাও! পড়ে এসো!

হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রশান্ত মনে নামায আদায় করলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আসমান-জমিনের রবের কসম! আমি মৃত্যুর ভয়ে নামাযকে দীর্ঘায়িত করেছি– তোমরা যদি এমনটি মনে না করতে, তা হলে আমি আরও কিছুক্ষণ নামায পড়তাম।

হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুই সর্বপ্রথম নিহত হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায়ের পদ্ধতি চালু করেছেন।

যখন তাঁকে শূলকাষ্ঠে চড়িয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হল, তখন তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে প্রভুর আরশের দরজায় কড়া নেড়ে ফরিয়াদ জানালেন–

হে পরওয়ারদিগার! আমরা আপনার রাসূলের বাণী পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! এই মুহূর্তে আমার কাছে এমন কোনো লোক বিদ্যমান নেই, যার মাধ্যমে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সালাম প্রেরণ করব। আমার মালিক! আপনার প্রিয় হাবীব প্রিয় পয়গাম্বর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আমার সালাম পৌঁছে দিন; এবং আমাদের সঙ্গে কৃত তাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করে দিন।

তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে সেসব দুশমনের জন্য বদদোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ! أَحْصِهِمْ عَدَدًا... وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا... وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.

হে আল্লাহ! এদেরকে আপনি গুণে গুণে ধ্বংস করুন, ছিন্নভিন্ন করে হালাক করুন, তাদের কাউকেই জীবিত থাকতে দিবেন না।

হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এই বদদোয়া করছিলেন, তখন তাঁর এ বদদোয়ার ভয়ে উপস্থিতদের একজন জমিনে শুয়ে পড়ে। তারপর এক বছরও অতিবাহিত হয়নি, এরই মধ্যে তাদের প্রত্যেকেই একজন একজন করে কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস যায়। তাদের কেউই জীবিত থাকতে পারেনি। কেবল ওই ব্যক্তিই বেঁচে ছিল, যে জমিনে শুয়ে পড়েছিল।

তারপর হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু এই কবিতা আবৃত্তি করলেন–

فَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ
وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَّشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُّمَزَّعِ

যখন আমি ঈমানের অবস্থায় নিহত হচ্ছি, তখন আর চিন্তা কীসের, যে কাতেই আমার মৃত্যু হোক তা আল্লাহর জন্যই হবে। আমার এ আমল আল্লাহ তাআলার জন্য, তিনি চাইলে চূর্ণ হাড়েও বরকত দিতে পারেন।

এরপর মুশরিকরা হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শূলে চড়িয়ে দিল। এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে মক্কার বাইরে তানয়ীম নামক স্থানে। আর মক্কা থেকে চারশ' কিলোমিটার দূরে সুদূর মদীনার মাটিতে বসে ঠিক ওই সময়েই –যখন হযরত খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের সঙ্গে কৃত ভয়ঙ্কর গাদ্দারি ও অমানবিক আচরণের কারণে সীমাহীন পেরেশান হলেন। নবীজী আশপাশে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার সংবাদ শোনাতে চাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর পবিত্র যবান থেকে বেরিয়ে এল–

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ خُبَيْب! وَعَلَيْكَ السَّلَامُ.

হে খুবাইব! তোমার উপরও আল্লাহ তাআলার শান্তি বর্ষিত হোক।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খুবাইবকে কুরাইশরা শহীদ করে দিয়েছে।

[ফাত্হুল বারী : ৭/৪৭৩-৪৮১, মা'রিফাতুস্ সাহাবা লি আবী নুআইম : ৮/২৭৮, দালাইলুন্ নবুউওয়া লি আবী নুআইম : ২/৫০৫-৫১১]

(৯)

আল্লাহ আবু যর এর উপর রহম করুন!

এটি ওই সময়কার কথা, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে তাবুকের পথে সফর করছিলেন। পথ ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ ও দূরাতিক্রম্য। মাথার উপর ঝরছিল কাঠফাটা রোদ। সূর্য যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করছিল। মানুষজন আস্তে আস্তে কেটে পড়ছিল। যারা ফিরে চলে যেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কিছুই বলতেন না।

একেক সময় সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অমুক ফিরে চলে যাচ্ছে! অমুকও সঙ্গ ত্যাগ করেছে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যারা চলে যাচ্ছে তাদের যেতে দাও। যদি এতে তোমাদের সামান্যতমও কল্যাণ সাধিত না হয়ে থাকে, তা হলে মনে করো আল্লাহ তোমাদেরকে তার অকল্যাণ থেকে হেফাজত করেছেন।

কাফেলা এগিয়ে চলছে মঞ্জিলপানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জানবাজ সাহাবায়ে কেরাম উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে পথ এগিয়ে চলছেন।

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু একজন উঁচু মাপের সাহাবী। তিনিও ছিলেন ওই কাফেলায়। তিনি যে উটের উপর সওয়ার ছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণকায়। চলতে চলতে তাঁর উট একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে তাঁর মাঝে ও কাফেলার মাঝে দূরত্ব ধীরে ধীরে বেড়েই চলছিল।

এক সময় তিনি কাফেলা থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেলেন। কয়েক মাইল সফর করার পর এক সাহাবী পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু নেই। সাহাবী আচানক বলে ওঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এবার তো আবু যরও চলে গেছে!

এবারও নবীজী সেই উত্তরই দিলেন, যা অন্যদের বেলায় দিয়েছেন। তিনি বললেন, যেতে চাইলে যেতে দাও। যদি তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকে, তা হলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাকে নিয়ে আসবেন। আর যদি এতে তোমাদের সামান্যতমও কল্যাণ সাধিত না হয়ে থাকে, তা হলে মনে করো আল্লাহ তাআলা তার অকল্যাণ থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।

হায় আবু যর! তাঁর উট তাঁকে ক্লান্ত করে ছেড়েছে; তাঁর সফরকে দুঃসাধ্য করে তুলেছে; কাফেলা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে! আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বারবার আক্ষেপভরা দৃষ্টিতে উটের দিকে তাকাচ্ছিলেন। প্রতি মুহূর্তেই তিনি কাফেলা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। এক সময় ভাবলেন, না; এভাবে আর না। তৎক্ষণাৎ তিনি উট থেকে নেমে পড়লেন। মালামাল নিজের কোমরে বাঁধলেন। উট সেখানেই ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করে দিলেন। পায়ের নিচে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি আর মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ– এর কোনোটিরই কোনো পরোয়া ছিল না তাঁর। নবীজীর কাফেলায় শরীক হওয়ার অদম্য বাসনায় ইসলামের এই দুঃসাহিক সিপাহী প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়ে দিওয়ানা হয়ে ছুটে চলেছেন।

পথিমধ্যে নবীজী এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন; ছাউনী ফেললেন। সাহাবায়ে কেরাম পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মনে হচ্ছে কেউ একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগন্তুকের দিকে তাকালেন। দেখলেন, আগন্তুক তাঁর সামানাদি নিজের কোমরের সাথে বেঁধে সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় তীরের তালাশে ছুটে আসছে। ধুলার চাদর কখনও তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, আবার কখনও তা সরে গিয়ে তাকে মানুষের সামনে উদ্ভাসিত করে তুলছিল। নবীজী বললেন, আল্লাহ করুন! সে যেন আবু যর হয়...!

সাহাবায়ে কেরাম মনোযোগ ও গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! এ তো আবু যরই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিগন্তের ওপার পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে বললেন–

يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرٍّ... يَمْشِيْ وَحْدَهُ... وَيَمُوْتُ وَحْدَهُ... وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ.

আল্লাহ আবু যরের উপর রহম করুন। সে একাকী আসছে। একাকীই সে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং একাকীই কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

নবীজীর এ দোয়ার পর কয়েক বছর কেটে গেল। নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

অতঃপর তিনিও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম জাহানের খলীফা হলেন। এ সময় হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীন ছেড়ে রবযা'য় চলে গেলেন। তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ইতিপূর্বেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

শুধু এক স্ত্রী ও এক ছেলে জীবিত আছেন। তাঁরা এক খোলা প্রান্তরে তাবু খাটিয়ে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

সময় তার আপন গতিতে এগিয়ে চলল। এক সময় বার্ধক্য এসে আবু যরকে ঘিরে ধরল। মৃত্যু তার আগমনী বার্তা জানাতে শুরু করল। আবু যরের স্ত্রী উম্মে যর কিছুই ভাবতে পারলেন না। জীবনসঙ্গীর শিয়রে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। আবু যর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, উম্মে যর! কাঁদছ কেন?

তিনি বললেন, কাঁদব না কেন? তুমিই তো আমার জীবনসাথি। এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে মৃত্যু এসে তোমাকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছে। তা ছাড়া এটি এমন এক জায়গা, যেখানে না আছে কোনো ঘরবাড়ি, না আছে কোনো মানব-মানবী। সুনসান মরু বিয়াবান। তোমাকে কাফন দেওয়ার মতো একটি কাপড়ও তো আমার কাছে নেই।

আবু যর বললেন, পাগলী! কাঁদ কেন? চোখের পানি মুছো। আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাচ্ছি। আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতকে সম্বোধন করে বলছিলেন, ওই জামাতে আমিও শরীক ছিলাম– তিনি বলেছেন–

لَيَمُوْتَنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

নিঃসন্দেহে তোমাদের একজন [জনমানবহীন] বিরান অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করবে। তার জানাযার নামায পড়ার জন্য মুসলমানদের একটি জামাত সেখানে হাজির হবে।

ওই সময় যত মানুষ আমার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলেই একজন একজন করে নিজ নিজ লোকালয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাদের মধ্যে কেবল আমি একাই বেঁচে আছি।
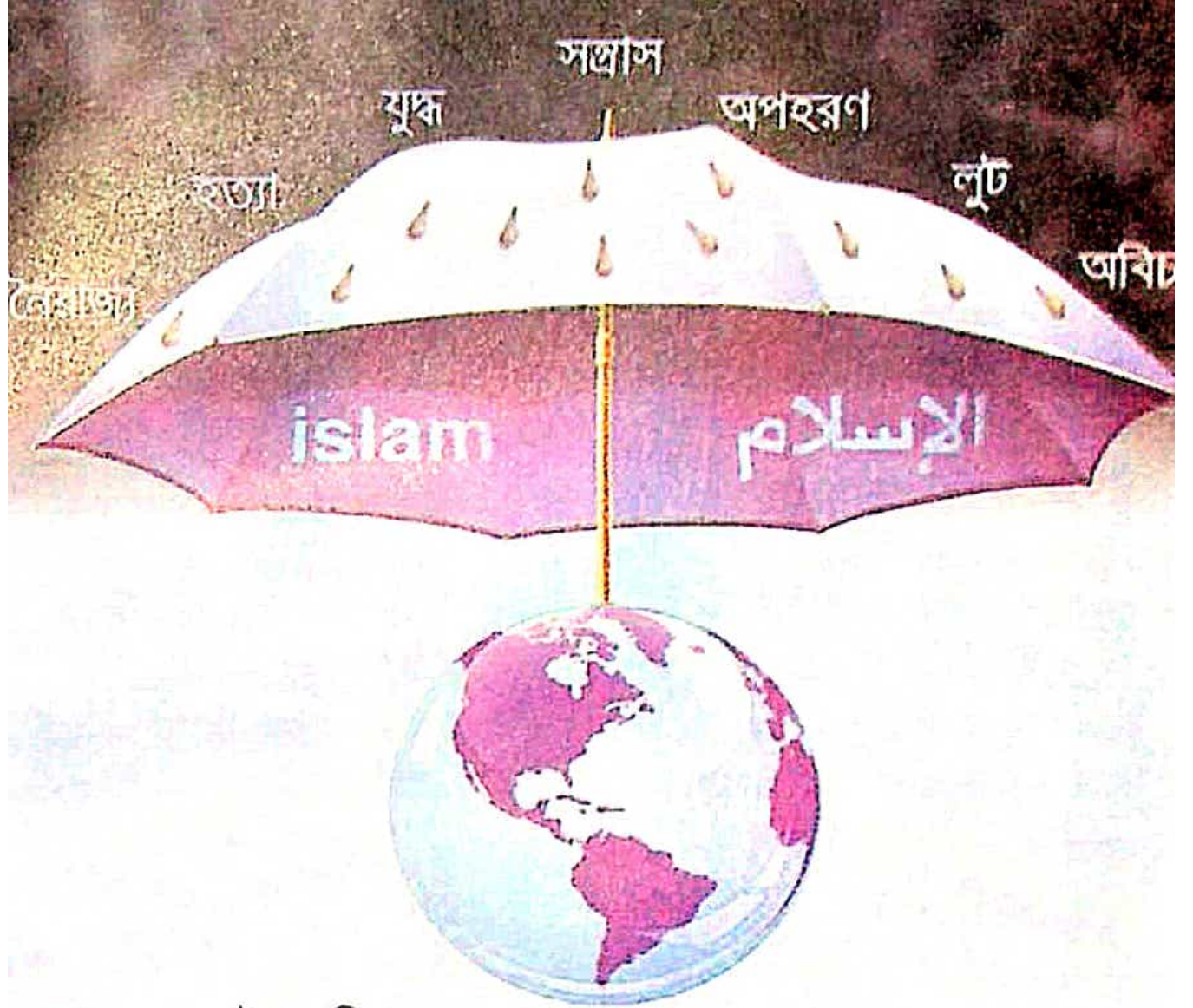
আর এখন এই মরুবিয়াবানে আমার মৃত্যু আসতে যাচ্ছে।

তারপর হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর কসম! না আমি ভুল বলেছি আর না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলেছেন। তুমি যাও! পথের দিকে তাকিয়ে দেখ। কেউ না কেউ অবশ্যই আসবে।

[উম্মে যর রাযিয়াল্লাহু আনহা] বললেন, এ সময় এখানে কে আসবে? এখন হজের মৌসুম। লোকজন সবাই হজ করার জন্য মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে। পথ-ঘাট সব বিরান পড়ে আছে।

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি যাও! গিয়ে তো দেখবে!

উম্মে যর রাযিয়াল্লাহু আনহা নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে পথের দিকে এগিয়ে গেলেন। বালুর টিলায় চড়লেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি ফেরালেন। চারদিকে ধু ধু বালুচর। রাস্তা-ঘাট বিরান। কোথাও কেউ নেই। কোনো পথিকও দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি ফিরে চলে এলেন। জীবনসঙ্গীর দেখভাল করলেন; তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

আবু যরের অবস্থা যখন একেবারেই অন্তিম মুহূর্তে, উম্মে যর তখন পুনরায় ওঠে দাঁড়ালেন এবং উদাস নয়নে পথের দিকে তাকাতে লাগলেন; এই আশায়– হয়তো বা অন্ধকারে কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু এবারও কাউকে দেখা গেল না। এবারও তিনি ফিরে এলেন।

উম্মে যর অত্যন্ত বিষণ্ন মনে বসে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল– কয়েকজন আরোহী নওজোয়ান তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। আরোহীরা একেবারে উম্মে যরের কাছে এসে সওয়ারী থেকে নামল। জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর বান্দী! আপনি পেরেশান কেন? উম্মে যর বললেন, এখানে একজন মুসলমান রয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পার করছেন। মনে হচ্ছে এখনই তাঁর প্রাণপাখি উড়ে যাবে। কিন্তু তাঁকে দাফন-কাফন করার মতো এখানে কেউ নেই! তোমরা কি তা করবে?

আগন্তুক : তিনি কে?

উম্মে যর : তাঁর নাম আবু যর।

আগন্তুক : ইনি কি সেই আবু যর, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী?

উম্মে যর : হাঁ, ইনি সেই আবু যর।

এ কথা শুনতেই তারা সজোরে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠল, আবু যর! আবু যর! তারা দৌড়ে তাবুর ভিতরে প্রবেশ করল এবং তাঁর শিয়রের পাশে গিয়ে বসল।

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে অভিবাদন জানালেন। অতঃপর কম্পিত কণ্ঠে ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, সাথিরা! বিগত দিনের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি জামাতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ওই জামাতে আমিও শরীক ছিলাম, নবীজীর সেই কথাগুলো হুবহু এখনও আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন–

لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

নিঃসন্দেহে তোমাদের একজন [জনমানবহীন] বিরান অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করবে। তার জানাযার নামায পড়ার জন্য মুসলমানদের একটি জামাত সেখানে হাজির হবে।

ওই মজলিসে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সকলেই নিজ নিজ এলাকা ও লোকালয়ে ইন্তেকাল করেছেন, যেখানে বহু মানুষের সমাবেশ ছিল। এখন একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি, যার জীবনপ্রদীপ এই লতাপাতা ও ঘাসপানিহীন মরুবিয়াবানে নিভতে যাচ্ছে। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না....? যদি আমার কাছে কিংবা আমার স্ত্রীর কাছে কাপড়ের এতটুকু টুকরাও থাকত, যা দিয়ে আমার দেহটুকু ঢাকা যায়, তা হলে আমি তোমাদের সামনে আমার এ জরুরত প্রকাশ করতাম না। তোমরা আমার এ ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ...?

আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আমাকে কাফন দিবে না, যে কোনো না কোনো কওমের সরদার কিংবা কোনো না কোনো গোত্র বা কবীলার নেতা কিংবা কর্ণধার।

তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তাদের মধ্যে কেউ-ই এমন ছিল না, যে উল্লিখিত পদবীগুলোর কোনোটিতে সমাসীন ছিল না। হাঁ, তাদের মধ্যে কেবল একজন আনসারী ছিল, যে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। সে বলল, চাচাজান! আমি আপনাকে কাফন দিব।

আপনি যতগুলো পদবীর কথা উল্লেখ করেছেন, আমি সেগুলোর কোনোটিতেই অধিষ্ঠিত নই। আমি আপনাকে আমার চাদর ও সূতার এ দু' কাপড়ে কাফন দিব; যা আমার মা আমার জন্য বুনে ছিলেন।

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনও নিজের কাফন-দাফন সংক্রান্ত কথাবার্তাই বলছিলেন। এরই মধ্যে হঠাৎ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আগন্তুক নওজোয়ানরা হযরত আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাফন-দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। এমন সময় আকস্মিকভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কূফায় বসবাসরত তাঁর সাথি-সঙ্গীদের নিয়ে এ অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাদেরকে দেখে তিনি থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কী হয়েছে?

উত্তর এল, এটি আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জানাযা। 'আবু যর' নামটি শোনামাত্রই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, ওহে! তোমরা শুনে রাখ! আমাদের মনিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যই বলেছিলেন–

يَرْحَمُ اللهُ أَبَا ذَرٍّ... يَمْشِيْ وَحْدَهُ... وَيَمُوْتُ وَحْدَهُ... وَيُبْعَثُ وَحْدَهُ.

আল্লাহ আবু যরের উপর রহম করুন। সে একাকী আসছে। একাকীই সে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে এবং একাকীই কেয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হবে।

এ বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সওয়ারী থেকে নীচে নামলেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন এবং নিজ হাতে তাঁকে দাফন করলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

[আস-সীরাতুন্ নববিয়্যাহ লি ইবনে কাসীর : ৪/১৫, আল-খাসায়িসুল কুবরা : ১/৪৫৩, মুসনাদে আহমাদ : ৫/১৬৬]
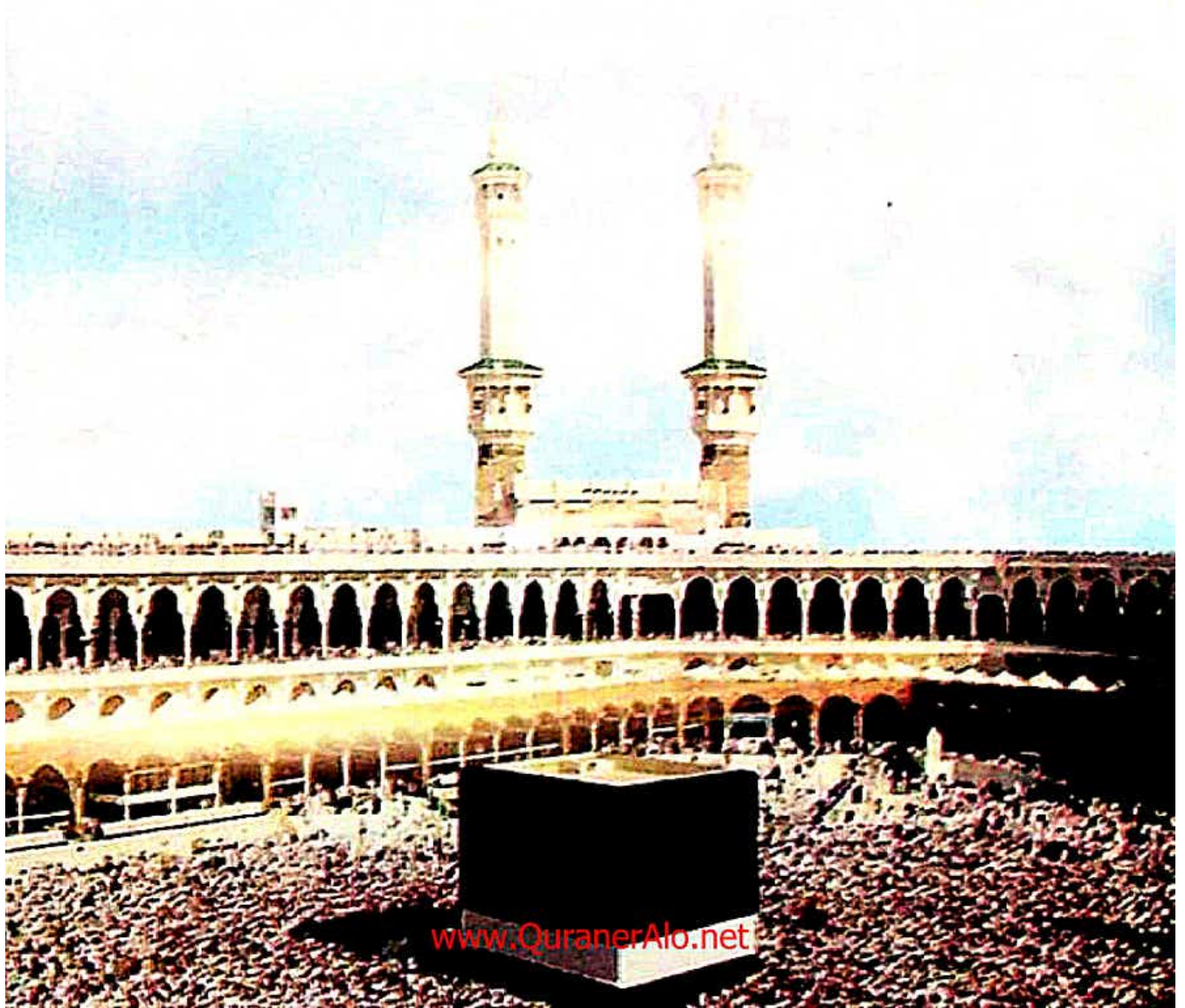
(১০)
অভূতপূর্ব মেহমানদারী

একবার এক অপরিচিত মুসাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ক্ষুধায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। [আমি খুবই ক্লান্ত। খাওয়ার মতো কি কিছু আছে?]
আগন্তুকের চেহারায় উপোসের আলামত সুস্পষ্ট। মনে হচ্ছিল যেন তিনি কয়েক দিন যাবৎ ক্ষুধার্ত।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন– তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে?

স্ত্রীর পক্ষ থেকে জওয়াব এল– কসম সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে একমাত্র পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। নবীজী দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন– তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? রুটি, খেজুর কিংবা দুধ?

তিনিও একই জওয়াব দিলেন– কসম সেই সত্তার! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে পিপাসা নিবারণের জন্য সামান্য পানি ছাড়া আর কিছুই নেই। নবীজী অপর স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তারপর আরেকজনের নিকট। এভাবে একে একে সকল স্ত্রীর নিকটই সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু সকলের একই জওয়াব– আমাদের কাছে একমাত্র পানি ছাড়া আর কিছুই নেই।

এবার নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ রাতে যে এই মেহমানের মেহমানদারী করবে, আমি তাকে আল্লাহর রহমতের হকদার হওয়ার ব্যাপারে জামানত প্রদান করছি। আল্লাহ তাআলা তার উপর স্বীয় রহমত বর্ষণ করবেন।

পাঠকদের এখানে স্মরণ করিয়ে দিই, সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল নবীজীর মতোই সাদাসিধে ও দারিদ্র্যপূর্ণ। অধিকাংশ সাহাবীদের অবস্থাই ছিল এমন যে, তাঁদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা হত তো সন্ধ্যায় খাওয়ার কিছু থাকত না। যদি সন্ধ্যায় কোনো ব্যবস্থা হয়ে যেত, তা হলে সকালের জন্য কিছু থাকত না।

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই চুপ। ওদিকে আগন্তুক মুসাফির ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি মেহমানদারীর অপেক্ষায় আশাভরা দৃষ্টিতে এক-একজন সাহাবীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। অবশেষে এক আনসারী সাহাবী 'লাব্বাইক' বলে ওঠে দাঁড়ালেন। বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মেহমানের মেহমানদারী করব। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন।

ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়ার মতো কিছু আছে? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, কিছুই নেই; শুধু বাচ্চাদের জন্য যৎসামান্য খাবার আছে। তা ছাড়া বাচ্চারা গতকাল থেকেই ক্ষুধার্ত। সকালেও তাদের খাওয়ার মতো কিছু ছিল না। সারা দিনে কেবল একবার খাওয়ার মতো যৎসামান্য ব্যবস্থা হয়েছে। আর এখন যা আছে, তা-ও যথেষ্ট হবে না; খুবই সামান্য।

সে ছিল এক চরম সংকটময় মুহূর্ত। সাহাবী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। একদিকে নিজেরাসহ সন্তানাদি না খেয়ে আছে, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ।

সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, বাচ্চারা ক্ষুধার্ত আছে থাকতে দাও।

আমি নবীজীর মেহমানকে না খাইয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারি না। তুমি যে কোনোভাবে বাচ্চাদের মন ভোলাতে থাক, যাতে তারা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে...

হায়! যাদের গতরাত কেটেছে না খেয়ে; দিনও অতিবাহিত হয়েছে ক্ষুধার যন্তণা নিয়ে; আজ রাতেও তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে অনাহারী রেখে! আমি উৎসর্গিত হই এমন প্রাণ উৎসর্গকারীদের উপর, যাঁরা নবীজীর একটিমাত্র ইশারায় নিজের সন্তানাদির মায়া-মমতাও বিসর্জন দিয়ে দিতে পারেন অবলীলায়। যে মা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, যে মা নিজে পিপাসার্ত থেকে সন্তানকে পান করান, সেই মা আজ রাতে দুই দিনের উপোস কলিজার টুকরোদের আবারও না খাইয়েই ঘুম পাড়াচ্ছেন; একমাত্র নবীজীর মেহমানের খাতিরে।

আর আমরা!! আমরা তো আমাদের সন্তানদের পার্থিব সুখ-শান্তির জন্য হালাল-হারামেরও তোয়াক্কা করি না। সন্তানাদিকে সুদের মাল খাইয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাকে সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছি। যেখানে সাহাবায়ে কেরাম ত্যাগ ও বিসর্জনের এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেখানে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাঁদেরকে কেন জান্নাতের সার্টিফিকেট দিবেন না!

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তাঁরা যে কেবল ছেলেমেয়েদের না খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মেহমানের মেহমানদারী করেছেন– তা নয়। ঘটনার পরের অংশটু-কুও শুনুন। ওই আনসারী সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমাদের মেহমান যখন খাবার খেতে বসবেন, তখন তুমি বাতির আলো ঠিক করার বাহানায় বাতি নিভিয়ে দিয়ো। যাতে মেহমান মনে করেন আমরাও তাঁর সঙ্গে খাবার খাচ্ছি। অতএব, তেমনটিই হল। অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মেহমানের কাছে দস্তরখানে বসলেন। মেহমান খাবার খাচ্ছিলেন আর স্বামী-স্ত্রী লৌকিকতা করে মুখ নাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় খাবার শেষ হল। ক্ষুধার্ত আগন্তুক মুসাফির পরিতৃপ্ত হয়ে বিদায় নিলেন।

সকালবেলা ওই আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ .

গতরাতে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন মেহমানের জন্য যে কুরবানী করেছে, আল্লাহ তাআলা তাতে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৪]

এ ছিল সেই সংবাদ, যা আরশ থেকে এসেছিল এবং সাত আসমান অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে ছিল যে, আপনার এক আত্মোৎসর্গকারী সাহাবী আপনার সম্মান এমনভাবে রক্ষা করেছে, যার দৃষ্টান্ত কেয়ামত পর্যন্ত পেশ করা যাবে না।

প্রিয় পাঠক! এ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মু'জিযাসমূহের প্রথম পর্ব, যা আমরা আপনার সামনে পেশ করলাম। এ সকল বিষয় আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করেছেন। অন্যথায় এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউই গায়েবের কোনো খবর জানে না। গায়েবের ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। একমাত্র তিনিই দৃশ্য-অদৃশ্যের খবর জানেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا .

(তিনি) অদৃশ্যের জ্ঞানী। অতঃপর তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না; তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার (ওই রাসূলের)

অগ্র-পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করে দেন। (যারা আল্লাহর হুকুমে তাঁকে হেফাজত করেন এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে থাকেন।) [সূরা জিন : ২৬-২৭]

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেছেন– তুমি মানুষদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দাও যে, 'আমি গায়েবের খবর জানি না।' যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি (তাদেরকে) বলে দাও, আমি আমার নিজের জন্যও কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণের মালিক নই, তবে যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তা হলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে কখনও আমার কোনো অমঙ্গল হত না। আমি তো কেবলমাত্র একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী (ওই সমস্ত লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে) এবং সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। [সূরা আ'রাফ : ১৮৮]

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীস আছে, যা এই বাস্তবতাকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তোলে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিজগতের কোনো মানুষ –চাই তিনি নবী হোন কিংবা ওলী– গায়েবের খবর জানেন না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনোও সংবাদের ব্যাপারে অবগত হওয়া কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার ব্যাপারে শতভাগ নির্ভুল সংবাদ প্রদান করা– এগুলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর

নবুওয়তের সত্যতার একেকটি স্পষ্ট নিদর্শন; এগুলো ইলমে গায়েব নয়। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা লুকমান : ৩৪]

সমস্ত সৃষ্টিজগতের কারও এ অধিকার নেই যে, সে বলবে– আমার কাছে গায়েবী বিষয়ের খবারাখবর উন্মোচিত হয় কিংবা আমি ভবিষ্যতের অবস্থা দেখতে পারি। কেউ যদি কারও ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনোও সংবাদ প্রদান করে, তা হলে তা বিলকুল মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতারণা। এগুলো ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং গায়েবের সংবাদদানকারী গণক, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী জ্যোতিষী কিংবা হাত দেখে ভবিষ্যতের ভাগ্য নিরূপণকারীদেরকে সত্যায়ন করা, তাদেরকে নিজের হাত দেখানো এবং তাদেরকে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলি ও বিষয়-আশয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিলকুল হারাম ও শিরক। আর শিরককারীর জন্য কেয়ামতের দিন ক্ষমা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই নিঃসন্দেহে।

(১১)
মহাজাগতিক বস্তুতে নবীজীর মু'জিযা

চাঁদ হয়ে গেল দ্বিখণ্ডিত!

কাফেরদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ধরনের চেষ্টাই করেছেন; সকল পন্থাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু জালিম কাফেররা সর্বদাই তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চিন্তায়ই লেগে থাকত। নবীজী তাদের সামনে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে নবুওয়তের প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু তারা প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করার পরিবর্তে বরাবরই মু'জিযা দেখানোর জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করত। একদিন তারা বলতে লাগল– 'মুহাম্মাদ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাক, তা হলে এই মহূর্তে আমাদের চোখের সামনে এ চাঁদটাকে দু' টুকরো করে দেখাও!'

তাদের কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে দোয়া করলেন– হে আল্লাহ! এরা যদি এই ওসিলায় জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে যায় এবং জান্নাতের হকাদার হয়ে যায়, তা হলে এ কাজ আপনার জন্য এমন কী কষ্টকর! হে আল্লাহ! আপনি চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিন!

নবীজীর দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতবাসী সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি অবলোকন করল। হঠাৎ চাঁদে ফাটল দেখা দিল। অতঃপর সেটি দু' টুকরো হয়ে দুই দিকে ছিটকে পড়ল।
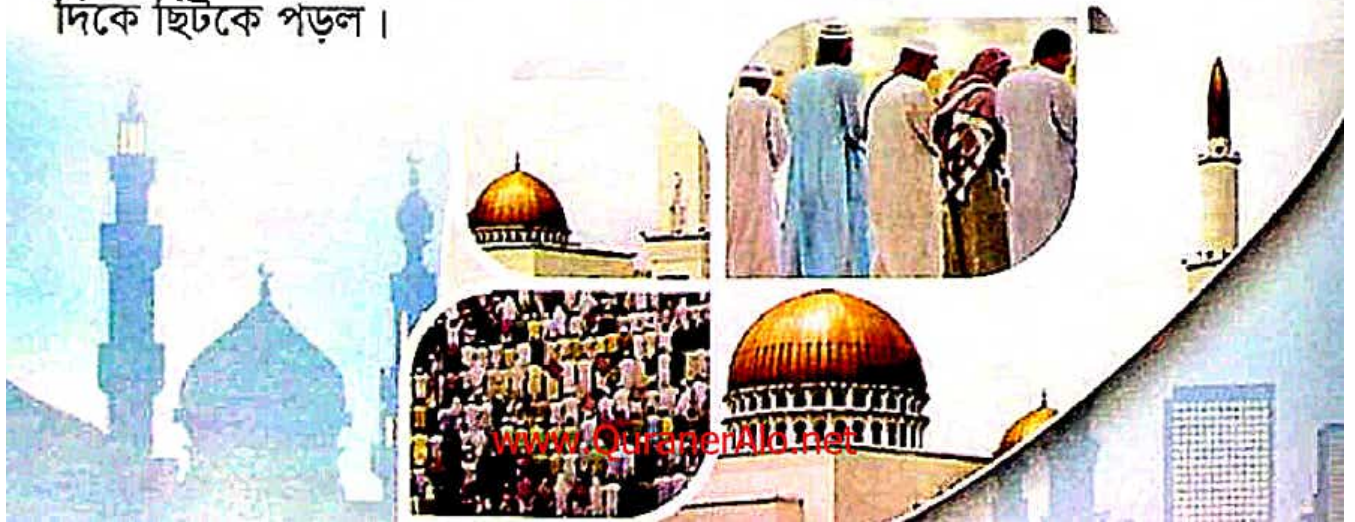
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বে আমি মক্কায় নিজ চোখে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছি। তার একটি টুকরো আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর ছিল আর অপর টুকরোটি সুওয়াইদা নামক জায়গায় চমকাচ্ছিল।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৩৬]

নিজ চোখে চাঁদকে দিখণ্ডিত হতে দেখে উপস্থিত কাফেররা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। বিস্ময়-বিহ্বলতার আধিক্যে তাদের চোখ যেন পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এত বড় মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের বোধোদয় হল না। তারা শয়তানের জালেই আটকা পড়ে রইল। চরম অযৌক্তিকভাবে তারা বলতে লাগল, এ তো জাদুগর। সে তার জাদুবিদ্যার বলে মানুষকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে।

এ ঘটনার পর কাফেররা তাদের চিন্তানৈতিক অস্থিরতা, মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও ভিতরগত দোদুল্যমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নিজেদের মাঝে বলাবলি করতে লাগল– আচ্ছা! যারা দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে মক্কায় আসবে, আমরা তাদেরকে এই ঘটনার সত্যাসত্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। যদি তারাও আমাদের মতো তাদের এলাকায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখে থাকে, তা হলে বুঝব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃতপক্ষেই সত্য নবী। কেননা, একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের উপর জাদুর প্রভাব বিস্তার করা তার সাধ্যের বাইরে। পক্ষান্তরে যদি তারা বলে যে, তারা চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখিনি, তা হলে বুঝে নিব আমাদের সামনে যা কিছু ঘটেছে, তা সুনিশ্চিত জাদু।

অতঃপর মুসাফিরদের প্রথম কাফেলা মক্কায় এসে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশরা তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য দৌড়ে গেল

এবং বলতে লাগল, তোমরা কি চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছ? তখন সবেমাত্র আগত মুসাফিররা বলতে লাগল, হাঁ হাঁ, আমরা অমুক রাতে নিজ চোখে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখেছি।

তারপর আরও মুসাফির এল; কাফেলা এল। তারাও একই জওয়াব দিল। সকলের কাছে একই জওয়াব শুনে কুরাইশরা ভাবল, এখন যদি আমরা তার এই মু'জিযা মেনে নিই, তা হলে তার নবুওয়তকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং তার গোলামী বরণ করে নিতে হবে। বরং এখন আমাদের জন্য উত্তম হবে কোনো বাহানা খুঁজে এ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা।

অতঃপর জিদ, বিদ্বেষ, হঠকারিতা, আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের কারণে ওই হতভাগারা নিজ চোখে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকে সত্যায়ন করল না। বরং অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও গোঁয়ারতুমির সঙ্গে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ সমস্ত মানুষকেই জাদু করে ফেলেছে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ওই মু'জিযার আলোচনা করেছেন এভাবে–
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ * خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.

কেয়ামত অতি নিকটে এসে গেছে, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা (মুশরিকরা) যদি কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোনো

উপকারে আসে না। অতএব, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (স্মরণ কর) যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে। তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল সদৃশ। [সূরা ক্বমার : ১-৭]

(১২)
মেঘ উড়ে এল মুষলধারে বর্ষিত হল

কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি তুলে আকাশের দিকে তাকিয়েছেন আর আকাশ তাঁর হুকুমের সামনে মাথানত করে দিয়েছে। একবার মদীনায় দীর্ঘ দিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছিল না। জমিন ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল। ক্ষেত-খামার সব উজাড় হয়ে গিয়েছিল। বাগ-বাগিচা বিরান হয়ে পড়েছিল। সবদিকেই পরিদৃষ্ট হচ্ছিল রুক্ষতা ও প্রাণহীনতার এক ভয়াবহ রূপ।

জুমার দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। মিম্বারে ওঠলেন। খুতবা দিতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে এক লোক মসজিদে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি খুতবা দিচ্ছিলেন। আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে চলে গেলেন। ঠিক নবীজীর বরাবর দাঁড়ালেন। নবীজীর খুতবার মাঝেই তিনি উঁচু আওয়াজে চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! মালামাল সব ধ্বংস হয়ে গেছে! ক্ষেত-খামার বিরান হয়ে গেছে! আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

আগন্তুক সীমাহীন পেরেশান ছিলেন। দম না ফেলে তিনি এক নাগাড়ে কথা বলেই চলছিলেন। তার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল। পশুপাখি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জমিন ফসলহীন হয়ে পড়েছিল। বৃষ্টিবঞ্চিত তৃষ্ণার্ত জমিনে কারও কোনো স্বস্তি ছিল না। এ পরীক্ষাগুলো তার ধৈর্যের পাত্র পূর্ণ করে দিয়েছিল।
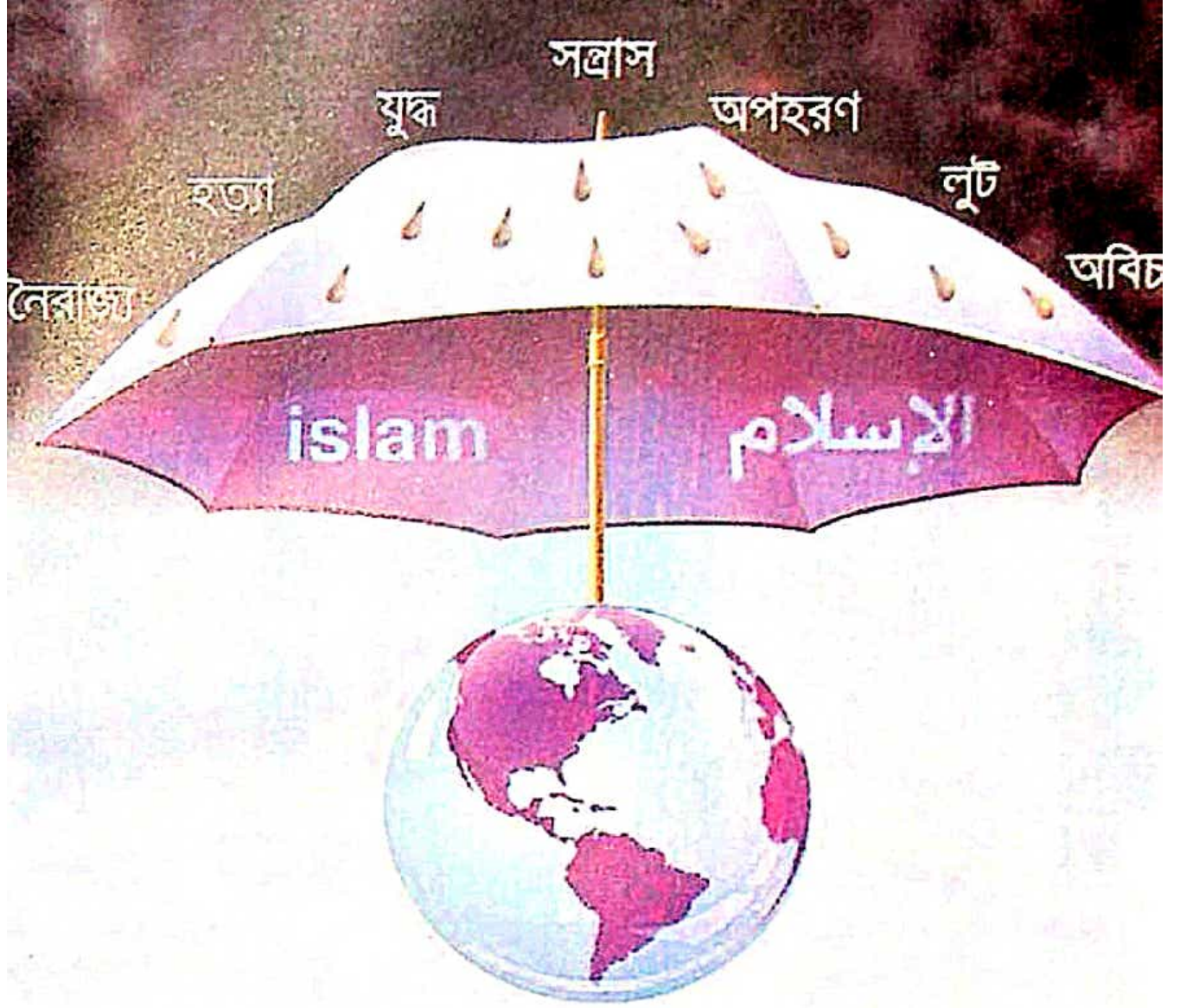
নবীজী আগন্তুক সাহাবীর দুঃখভারাক্রান্ত কথাগুলো শুনে বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ আকাশের দিকে হাত ওঠালেন। তারপর অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে কেঁদে কেঁদে রব্বে কারীমের দরবারে প্রার্থনা জানালেন–

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا... اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا... اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا...

হে আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তখন আকাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মেঘ-বাদলের নাম-নিশানাও ছিল না। আকাশ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় চমকিত দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের চূড়াগুলো স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়সমূহ ও আমাদের মাঝে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। পুরো পরিবেশটাই একদম স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তখনও নবীজীর হাত উঠানোই ছিল। হাঠাৎ আকাশে পাহাড়ের মতো বড়

বড় মেঘখণ্ড দেখা গেল। নবীজী তখনও মিম্বার থেকে অবতরণ করেননি। এরই মধ্যে আমি দেখলাম, নবীজীর দাড়ি মোবারক ভিজে ভিজে বৃষ্টির ফোঁটা ঝড়ছে!

তারপর আকাশ মুষলধারে বর্ষণ করতে শুরু করল। সেই দিন বর্ষণ করল। তার পর দিনও বর্ষণ করল। তার পরের দিনও বর্ষণ করল। অতঃপর তার পরের দিনও বর্ষণ করল। চতুর্দিকে পানিতে থৈ থৈ হয়ে গেল। অনাবাদী জমি পানিতে সয়লাব হয়ে গেল। পিপাসার্ত প্রাণীকুলের পিপাসা নিবৃত্ত হল। এভাবে অনবরত বৃষ্টি হচ্ছিলই। হতে হতে পরবর্তী জুমা এসে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেওয়ার জন্য তাশরীফ আনলেন। মিম্বারে ওঠলেন। হাঠৎ এক ব্যক্তি মসজিদের সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, যে দরজা দিয়ে গত জুমায় প্রবেশ করেছিলেন। ওই ব্যক্তিই ছিলেন কিংবা অন্য কেউ হবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। খুতবা দিচ্ছিলেন। আগন্তুক এগিয়ে এলেন এবং নবীজীর একদম সামনাসামনি হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর বলতে লাগলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! মালামাল ধ্বংস হয়ে গেছে! ঘরবাড়ি ধসে গেছে! রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেছে! এবার আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন বৃষ্টি থেমে যায়। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও দোয়ার হাত ওঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اَللّٰهُمَّ ! عَلَى الْآكَامِ، وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ .

ইয়া আল্লাহ! আমাদের উপর নয়; আমাদের আশপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! টিলাসমূহের উপর, পাহাড়সমূহের উপর, উপত্যকাসমূহে এবং গাছসমূহের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।
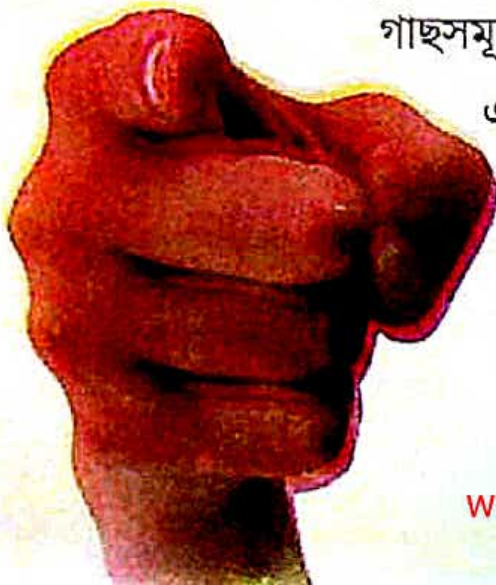
এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণের জন্য থামলেন এবং নিজের হাত দিয়ে আকাশে ছেয়ে থাকা মেঘমালাকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন।
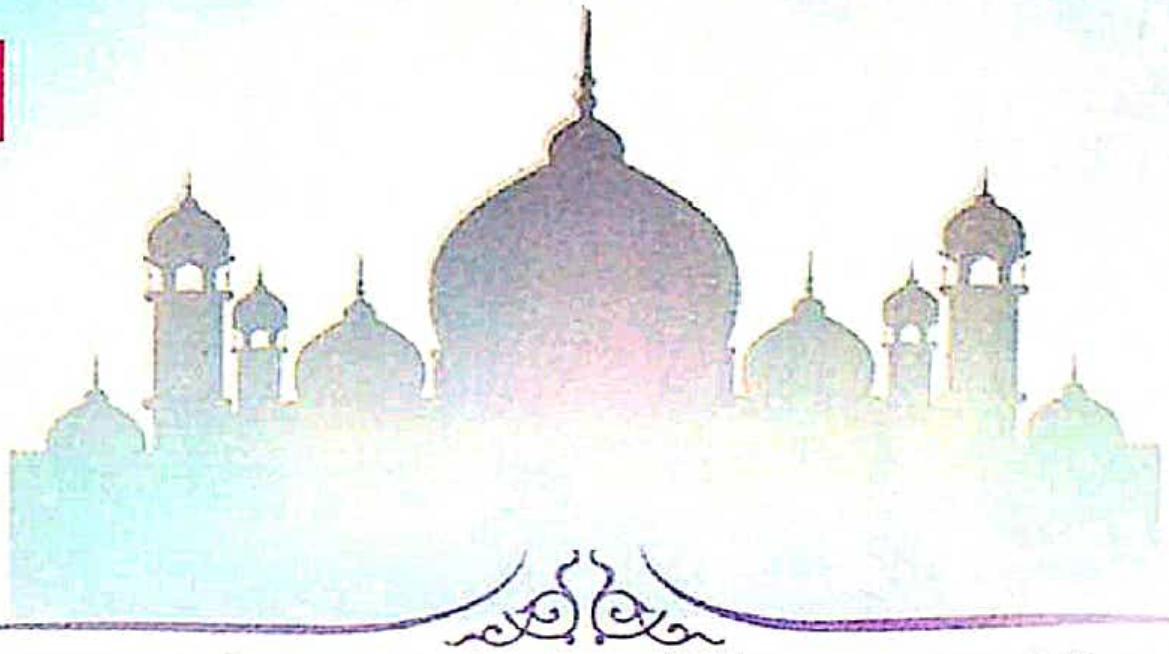
হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিকেই ইশারা করছিলেন, সেদিককার মেঘমালায় তখনই ফাটল ধরে যাচ্ছিল এবং মেঘখণ্ডগুলো টুকরো টুকরো হয়ে দূরে সরে যাচ্ছিল। এমনকি আমি দেখলাম পুরো মদীনা থেকে মেঘ সরে গেছে। আকাশ স্বচ্ছ-পরিষ্কার হয়ে গেছে। মদীনার আশপাশে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু মদীনায় তখন বৃষ্টির একটি ফোঁটাও বর্ষিত হচ্ছিল না।

কানাত উপত্যকায় এক মাস পর্যন্ত বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। বাইরে থেকে যে কোনো মুসাফিরই মদীনায় আসত, তার মুখেই শোনা যেত– 'আরে! মদীনার বাইরে তো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।'

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৩৩, ১০১৩]

এ সবই ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার বরকত।

বলাবাহুল্য, এ কথা তো নিঃসন্দেহ ও যে কোনো ধরণের শক-সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামান্য একটু ইশারাতে আকাশের মেঘমালা যে বশ্যতা স্বীকার করেছে, তা কেবলই আল্লাহ তাআলার হুকুম ও কুদরতের কারিশমা আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেঘমালার উপর এ হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ঠিক তেমনিভাবে দান করেছেন, যেমনিভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীদেরকে সুস্থ করে দিতেন; মৃতদেরকে قُمْ بِإِذْنِ اللهِ [আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও] বলে জীবিত করে দিতেন।

যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, তা হলে এ ধরণের এখ্তিয়ার কাউকেই দিতেন না। না কোনো নবীকে দিতেন, আর না অন্য কাউকে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কোনো না কোনো হেকমতে কোনো কোনো নবীকে কখনও কখনও এ ধরণের অসাধারণ ক্ষমতা বলে বলীয়ান করে দিতেন। তবে এ জাতীয় হেকমত কেবল আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ও এখ্তিয়ারের উপরই নির্ভরশীল।

(১৩)
প্রাণীকুলের উপর কর্তৃত্ব

বকরীর শুষ্ক স্তন থেকে দুধের ফোঁটা!

কুরাইশ কাফেররা যখন মুসলমানদের জন্য মক্কায় টিকে থাকা অসম্ভব করে তুলেছিল, মুসলমানরা তখন ধাপে ধাপে বিভিন্ন এলাকায় হিজরত করতে শুরু করেছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একদিন প্রিয় জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরত করেছেন। এক রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে সাথে নিয়ে প্রিয় মক্কাকে আল-বিদা বলে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু'র গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাও তাঁদের সঙ্গে ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত লাইছী রাহ্বার হিসেবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে কুরাইশরা ঘোষণা করে দিয়েছিল– যে কেউ-ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথিদেরকে ধরে এনে দিতে পারবে, তাকে অত্যন্ত মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভে অনেকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বের হয়ে পড়ল। রাস্তায়-রাস্তায়, পথে-ঘাটে, প্রতিটি অলিতে-গলিতে তারা অনুসন্ধান করতে লাগল।

কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটল না। অন্যদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফেলা গন্তব্য পানে এগিয়ে চলছিল। সফরের মাঝে এক পর্যায়ে তাঁদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আরব নারী উম্মে মা'বাদ খুযায়িয়্যা'র তাবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। উম্মে মা'বাদ ছিল অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক নারী। অধিকাংশ সময় সে তার তাবুর বাইরে দরজার পাশে বসে থাকত। সেখান দিয়ে অতিক্রমকারী মুসাফিরকে পানি পান করাত। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকলে খাবারও খাওয়াত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, মুহতারামা! আপনার কাছে কি কোনো গোশ্‌ত বা দুধ আছে? আমরা কিনতে চাই।

উম্মে মা'বাদের নিকট গোশ্‌ত কিংবা দুধ কোনোটাই ছিল না। সে অপারগতা প্রকাশ করে বলল, যদি আমার কাছে তেমন কিছু থাকত, তা হলে আমি আপনার মেহমানদারীতে কোনো ত্রুটি করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিক-ওদিক তাকালেন। জায়গাটি আসলেই গরিব, অসহায় ও দুঃস্থদের আবাস বলে মনে হচ্ছিল। জমি ছিল অনাবাদী; পশুগুলি ছিল জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল। ওদিকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথি-সঙ্গীরা কষ্ট পাচ্ছিলেন।

নবীজী দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকালে তাবুর এক কোণে জীর্ণশীর্ণ একটি বকরি দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুহ্‌তারামা! এ বকরিটি কেমন? উম্মে মা'বাদ জওয়াব দিল, জনাব! এটি এতটাই দুর্বল যে, দুর্বলতার কারণে সে অন্যান্য বকরির সঙ্গে চড়তেও যেতে পারেনি; এখানেই রয়ে গেছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি দুধ দেয়? উম্মে মা'বাদ নিবেদন করল, জনাব! এর দুধ শুকিয়ে গেছে আজ বহুদিন হল। এ বেচারী তো পা তুলে চলতেও পারে না, দুধ দিবে কোত্থেকে?

নবীজী বললেন, আপনি কি আমাকে এ থেকে দুধ দোহনের অনুমতি দিবেন? উম্মে মা'বাদ বলল, আপনি যদি এই বকরি থেকে কোনো দুধ পান, তা হলে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

নবীজী বললেন, বকরিটি নিয়ে আসুন। বকরি আনা হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নাম নিয়ে তার উপর হাত বুলালেন। অতঃপর আবার আল্লাহর নাম নিয়ে তার স্তনে হাত লাগালেন। তারপর একটি বড় পাত্র আনার জন্য বললেন।

হঠাৎ বকরির স্তন ফুলে ওঠল এবং বকরিটি তার পা ছড়িয়ে দুধ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রটি নীচে রাখলেন। দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। বকরির স্তন থেকে দুধের ধারা এমনভাবে ঝড়তে লাগল, যেন সে বহুদিন যাবৎ এই মহিমান্বিত মুসাফিরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল– তিনি আসবেন তো দুধ দোহন করতে দিব, অন্যথায় কাউকে স্তনে হাতও দিতে দিব না। বকরিটি এই পরিমাণ দুধ দিল যে, পাত্র ভরে গেল। এই দুধ নবীজী উম্মে মা'বাদকে দিলেন। সে পান করল। তারপর সাহাবী পান করলেন। সকলেই পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। তারপর নবীজী নিজে পান করলেন।

তারপর নবীজী বকরিটিকে দ্বিতীয়বার দোহন করতে শুরু করলেন। এবারও পাত্র ভরে গেল। নবীজী তা উম্মে মা'বাদের নিকট সোপর্দ করে দিয়ে আপন গন্তব্যপানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উম্মে মা'বাদ শুধু তাকিয়েই রইল। তার কথা বলার কোনো ভাষা ছিল না। তখনও সে বিস্ময়াবিভূত; বিস্ময়কর বরকতময় সময়ের ভাবনাতেই ডুবে ছিল।

এরই মধ্যে তার স্বামী আবু মা'বাদ দুর্বল, অক্ষম, ও খালিপেট বকরিগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে এসে বাড়ি পৌছল। বকরিগুলো ছিল ক্ষুধার্ত। চড়ে-ফিরে খাওয়ার মতো তাদের কিছুই জোটেনি।

ততক্ষণে আবু মা'বাদের নজর গিয়ে পড়ল দুধের উপর। দুধ দেখে সে তো অবাক! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, উম্মে মা'বাদ! আমাদের ঘরে তো দুধ দেওয়ার মতো কোনো পশু নেই; বকরি যা আছে তার তো দুধ শুকিয়ে গেছে সেই কবে! তবে এই দুধ এল কোত্থেকে?

উম্মে মা'বাদ বলল, আল্লাহর কসম! আজ এদিক দিকে বরকতের এক আধার অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি তার বরকতে সব কিছু পরিপূর্ণ করে দিয়ে গেছেন; এমনই পূর্ণতা যা মানবীয় চিন্তার ঊর্ধ্বে। তারপর উম্মে মা'বাদ সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। আবু মা'বাদ শুনছিল আর বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু যাচ্ছিল। সে ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠল, আমাকে ওই ব্যক্তির আকৃতি-গঠন সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা দাও! আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় এই ব্যক্তিই সেই ব্যক্তি, কুরাইশরা যাকে হন্যে হয়ে চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি করছে।

উম্মে মা'বাদ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকৃতি-গঠনের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই চিত্র তুলে ধরল–

দেহের রঙ উজ্জ্বল। গড়নে সৌন্দর্যের আধার। চেহারা দীপ্তিময়। দেহ মেদবহুল নয় যে মন্দ লাগবে। মাথার চুলেও কোনো ত্রুটি নেই। হাস্যোজ্জ্বল কান্তিময় ও সুদর্শন। চোখ দু'টি তাঁর সুরমামাখা। পলক দীর্ঘ। স্বর ভারী। ঘনকালো ভ্রু। দীর্ঘকায় গ্রীবা। ঘন দাড়ি; ইষৎ কুঞ্চিত। চুপ থাকলে তিনি অতিশয় গম্ভীর, অন্যথায় তাঁর আওয়াজ উঁচু, বলিষ্ঠ ও শ্রুতিমধুর। কথা বলেন থেমে থেমে; স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায়। তাঁর কথা বাহুল্যপূর্ণ নয়; নয় খুব সংক্ষিপ্ত। তাঁর কথা যেন মুক্তার মালা। দূর থেকে দেখলে সবচেয়ে আকর্ষণীয়; কাছ থেকে দেখলে সবচেয়ে অতুলনীয়। এত খাটো নয় যে অসুন্দর লাগবে; যেন সমান দুটি শাখার উপর স্থাপিত একটি শাখা; যা দেখতে চিরসুন্দর, চিরসবুজ।

গঠন-আকৃতি ও শোভা-সৌন্দর্যের উপমা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ, যেন নিজের মন মতো করে বানানো। তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীরা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল, যেন চাঁদকে ঘিরে রেখেছে তারকারাজি। কিছু বললে শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হুকুম দিলে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তাদের হৃদয়ের স্পন্দন সৃষ্টি হয় তাঁরই মহব্বতে। তাঁর চোখের ইশারায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়া গর্বের বিষয় মনে করে। তাঁর তরে প্রাণ উৎসর্গকারীরা সর্বদা তাঁর পলক পড়ার অপেক্ষায় থাকে। তিনি মেশ্‌ক ও গোলাপ; দুর্লভ জওহার। তাঁর কপাল কখনও কুঞ্চিত হয় না। যে একবার তাঁর সৌন্দর্য-শোভা দেখবে, জীবনে কখনও সে তাঁকে ভুলবে না।

উম্মে মা'বাদ নবীজীর গুণ গেয়ে যাচ্ছিল আর হয়রান হয়ে ভাবছিল, তাঁর কোন গুণটি বর্ণনা করবে আর কোনটি বাদ দিবে!

এরই মধ্যে আবু মা'বাদ বলে ওঠল, আল্লাহর কসম! ইনিই সেই ব্যক্তি, কুরাইশরা যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে! যদি জীবন আমার সহায় হয়, তা হলে অবশ্যই আমি তাঁকে খোঁজে বের করব। তাঁর পা-ছোঁয়া মাটি মাথায় মাখব। সারা জীবন তাঁর গোলামীতে কাটিয়ে দিব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বাকি থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে রক্তের একটি বিন্দুও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে তাঁকে খুঁজে ফিরব।

[দালাইলুন্নবুউওয়া লিল বায়হাকী : ১/২৭৬, আল-মুস্‌তাদ্‌রাক লিল হাকেম : ৩/৯,১০, হাদীস নং ৪২৭৪ এর সনদ হাসান।]

(১৪)
অবাধ্য উট নবীজীর পায়ে ঝুঁকে পড়ল

এক আনসারী পরিবারের একটি উট ছিল। পরিবারটি ওই উট দিয়ে বোঝা বহনের কাজ করাত। কুয়া থেকে পানি তুলে তার উপর চাপিয়ে নিয়ে আসত। হঠাৎ একদিন উটটি অবাধ্য হয়ে গেল। কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসল। তার উপর কোনো কিছু রাখলে সে বসে পড়ে; ওঠার আর নাম নেয় না। উটটি একেবারেই বেয়াড়া হয়ে গেল। পরিবারের লোকজন না তাকে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারছে, আর না তাতে সওয়ার হতে পারছে। তাদের সমস্ত কাজকর্ম স্থবির হয়ে পড়েছে। তারা ছিল গরিব মানুষ। আরেকটি উট কিনার মতো সামর্থ্যও তাদের ছিল না। ফলে তারা পেরেশান হয়ে পড়ল।

অপারগ হয়ে অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হল। নিবেদন করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের একটিই মাত্র উট ছিল। তার উপর বহন করে আমরা পানি আনতাম। সেই উটটি আজ অবাধ্য হয়ে গেছে। তার পিঠের উপর কোনো কিছুই রাখতে দেয় না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! পানির অভাবে আমাদের ফসলাদি ও খেজুর শুষ্ক হয়ে গেছে!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওঠো!' অতঃপর সকলে ওঠলেন এবং নবীজীর সঙ্গে চলতে শুরু করলেন।

বাগানে প্রবেশ করে দেখলেন, উটটি এক কোনায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে। নবীজী তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ভয়ে আনসারী সাহাবীদের বুক কাঁপতে লাগল। কারণ, অবাধ্য উট খুবই ভয়ংকর। সে না আবার নবীজীর কোনো ক্ষতি করে ফেলে! তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ উট তো পাগলা কুকুরের ন্যায় হিংস্র হয়ে গেছে! আপনাকে আক্রমণ করে বসবে!

নবীজী বললেন, এর পক্ষ থেকে আমার কোনো আশঙ্কা নেই। নবীজী তার দিকে এগিয়ে চললেন। উটটি নবীজীকে দেখেই তাঁর দিকে দৌড়ে আসতে লাগল।

এ দেখে সাহাবায়ে কেরামের আতঙ্ক চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে পৌছল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক! উটটি নবীজীর কাছাকাছি এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

নবীজী উটের কপাল স্পর্শ করলেন। উট অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে নবীজীর সামনে মাথা নত করে দিল। নবীজী খুবই শান্তভাবে তার নাকে রশি পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে বাঁধলেন।

সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বুদ্ধিহীন হওয়া সত্ত্বেও এক অবুঝ প্রাণী আপনার সামনে সেজদা করার জন্য লুটিয়ে পড়ল! আমরা তো মানুষ। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বুঝশক্তি আছে। তা হলে আমাদের তো আরও উত্তমরূপে আপনার সামনে সেজদাবনত হওয়া উচিত।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন–
لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

কোনো মানুষের জন্য এটা শোভন (জায়েয) নয় যে, সে কোনো মানুষকে সেজদা করবে। যদি কোনো মানুষের জন্য অন্য কোনো মানুষকে সেজদা করার অনুমতি থাকত, তা হলে আমি নারীদেরকে হুকুম দিতাম তাদের

স্বমীকে সেজদা করার জন্য। এ জন্য যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর অনেক হক রয়েছে।

[মুসনাদে আহমাদ : ৩/১৫৮-১৫৯, দালাইলুন্নবুওয়া লি আবী নুয়াইম : ২/৩৮৫, হাদীস নং ২৮৭]

বুদ্ধিহীন ও নির্বোধ প্রাণীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই প্রভাব ও এখ্তিয়ার একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুম ও তাঁর ইচ্ছারই প্রতিফলন। যেমন, হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটনী কস্ওয়ার উপর সওয়ার হয়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসছিলেন। পথে চলতে চলতে হঠাৎ উটনী তার হাঁটু ফেলে বসে পড়ল। নবীজী তাকে অগ্রসর করতে চাইলেন, কিন্তু সে বিন্দুমাত্রও নড়ল না। লোকজন চিৎকারে করে বলে ওঠল, কস্ওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে! কসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কস্ওয়া অবাধ্য হয়নি। এমনটি করা তার এখ্তিয়ারাধীন নয়। বরং তাকে ওই মহান সত্তা থামিয়ে দিয়েছেন, যিনি হাতিওয়ালা 'আবরাহা ও তার সাথি-সঙ্গীদের' মক্কায় হামলা করা থেকে অক্ষম করে দিয়েছিলেন।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ কুরাইশরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা সম্বলিত যে কোনো শর্তেই সন্ধি করবে, আমি সেই শর্তেই সন্ধি করতে প্রস্তুত।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশের মাঝে হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত হয়। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩১, আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী : ৯/২১৯ এর সনদ সহীহ।]

(১৫)

অসুস্থদের সুস্থতা লাভ

বিস্ময়কর কাহিনী

আবু রাফে সালাম ইবনে আবী হাকীক। সে ছিল ইহুদীদের সরদার। সে সারাক্ষণই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ফিকিরে থাকত। বিভিন্নভাবে সে নবীজীকে কষ্ট দিত। যেন এটাই ছিল তার পেশা। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার জন্য সব সময়ই মক্কার মুশরিকদেরকে উস্‌কানি দিত। এ হতভাগা মদীনা থেকে দূরে খাইবারের কাছাকাছি একটি দুর্গে বসবাস করত।

আবু রাফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের অপবাদ আরোপ করত; মিথ্যা বদনাম রটাত। যে কেউ-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অন্যায় অসত্য কথ বলত, সে তাকেই সাহায্য করত। যে-ই নবীজীকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করত, তাকেই সে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সকলের অগ্রে থাকত। সে কবীলায়ে গাত্‌ফানকেও সাহায্য করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রে আরবের মুশরিকদেরকে অঢেল ধন-সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেছিল। সে তাদেরকে এ বলে উৎসাহ দিত যে, তোমরা মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যত ধন-সম্পদ খরচ করবে তার যিম্মাদারী আমার। সে মক্কার মুশরিকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে উস্‌কানি দিত এবং উত্তেজিত করে বলত, 'এসো আমরা সকলে মিলে মুহাম্মাদকে শেষ করে দিই।

আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা এতটা শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ এখনও বেঁচে আছে! ওঠো! এখনও সময় আছে তাকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেল।'

খন্দকের যুদ্ধের সময় ইসলামের সকল শত্রুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্র করার জন্য সে দিন-রাত এক করে ফেলেছিল। এ-ই ছিল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত মুশরিকদেরকে নবীজীর বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এ-ই ছিল সেই ব্যক্তি, যে বনু কুযাইরার ইহুদীদেরকে নবীজীর সঙ্গে কৃত সমস্ত ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাঁকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল। তার কারণেই তারা নবীজীর সঙ্গে খেয়ানত ও বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। এককথায় নবীজীর বিরুদ্ধে যা করা যায়, তার কোনোটিই করতে সে ত্রুটি করেনি।

আবু রাফে এর অবাধ্যতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তার ফেতনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ছোট্ট একটি বাহিনী তৈরি করা হল। তাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ও আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও শরীক ছিলেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সূর্যাস্তের পূর্বেই এ তিনজন মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আবু রাফে তার কেল্লায়ই ছিল। তারা যখন কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছলেন, সূর্য তখন ডুবে গেছে।

আবু রাফে যে কেল্লায় বসবাস করত, সেটি ছিল অত্যন্ত উঁচু ও মজবুত। তা অতিক্রম করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য বরং অসম্ভব ব্যাপার। বাইরে আসা-যাওয়ার জন্য তার কেবল একটিই ফটক ছিল। সকালে রাখাল ও কৃষকরা বের হয়ে যাওয়ার পর তাতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হত। আবার সন্ধ্যায় তালা খোলা হত। বাইরের লোকজন ভিতরে প্রবেশ করার

পর আবারও সেটি বন্ধ করে দেওয়া হত।

আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি দারোয়ানের কাছে যাচ্ছি। কথায় কথায় তাকে ভোলানোর চেষ্টা করব। হতে পারে সে আমার কথার ফাঁদে পা দিয়ে আমাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিবে।

আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন, দারোয়ান খুবই বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও চালাক লোক। যে-ই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, তাকেই সে ঘুরে ঘুরে ভালোভাবে পরখ করে এবং চিনতে পারে যে, সে কে?

আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ভিতরে প্রবেশের সুযোগ খুঁজছেন। সূর্য তখন ডুবে গেছে। লোকজন নিজেদের পশুপাল হাঁকিয়ে চারণভূমি থেকে ফিরে আসছে এবং সেগুলোকে ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছে। হঠাৎ তাদের খেয়াল হল, তাদের একটি গাধা চারণভূমিতে রয়ে গেছে। চতুর্দিকে তখন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। লোকজন মশাল নিয়ে গাধার খোঁজে বেরিয়েছে। গাধার খোঁজে তারা পেরেশান। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু কেল্লার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। হঠাৎ তিনি কিছুটা ভয় অনুভব করলেন– কেউ না আবার আমাকে চিনে ফেলে! তিনি তাঁর মাথা ঢেকে নিলেন। যাতে মানুষ মনে করে– কেউ হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বসে আছে। ওদিকে ইহুদীদের হারানো গাধা পাওয়া গেছে। তারা কেল্লার দিকে ফিরে আসছে। দারোয়ান চিৎকার দিয়ে আওয়াজ দিল– কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি এসো।

দারোয়ান আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকেও দেখল। সে মনে করেছে এ-ও আমাদের কেল্লারই কেউ হবে। তাই সে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আওয়াজ দিয়ে বলল, ভিতরে যেতে চাইলে জলদি কর। ফটক বন্ধ করে দিব। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সতর্কতার সঙ্গে ইহুদীদের কেল্লায় ঢুকে গেলেন।

তিনি ভিতরে প্রবেশ করে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরালেন। কোথাও কোনো লুকানোর মতো জায়গা পেলেন না। তবে ফটকের পাশেই গাধা রাখার একটি জায়গা দেখতে পেলেন। তিনি সেখানেই গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন। লোকজন সকলে ভিতরে চলে আসার পর হযরত আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলেন যে, দারোয়ান কোথায় কেল্লার চাবি রাখে! তিনি দেখলেন, দারোয়ান চাবিগুলো সুরক্ষিত একটি স্থানে রেখে দিল। তিনি তারপরও কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকলেন।

সবাই যখন বে-খবর হয়ে গেল এবং বাতিগুলো নিভিয়ে দিল, আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। দারোয়ান যেখানে চাবিগুলো রেখেছিল সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। চাবি পেয়েই তিনি কেল্লার ফটকের তালা খুলে দিলেন। পূর্ণিমার ভরা চাঁদ তখন মাথার উপর আলো ছড়াচ্ছিল। জ্যোৎস্নার আলোতে সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। খুব দ্রুত তিনি তাদের ঘরগুলোর দিকে মনোযোগী হলেন এবং সব ক'টি ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যেতে যেতে আবু রাফে এর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তার থাকার ঘর ছিল দোতলায়। যেখানে সিড়ি ছাড়া পৌঁছা সম্ভব ছিল না।

আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু রাফে এর আওয়াজ শুনতে পেলেন। আবু রাফে তার সঙ্গী-সাথিদের সঙ্গে কথা বলছিল। রাতের বেলায় সে তার
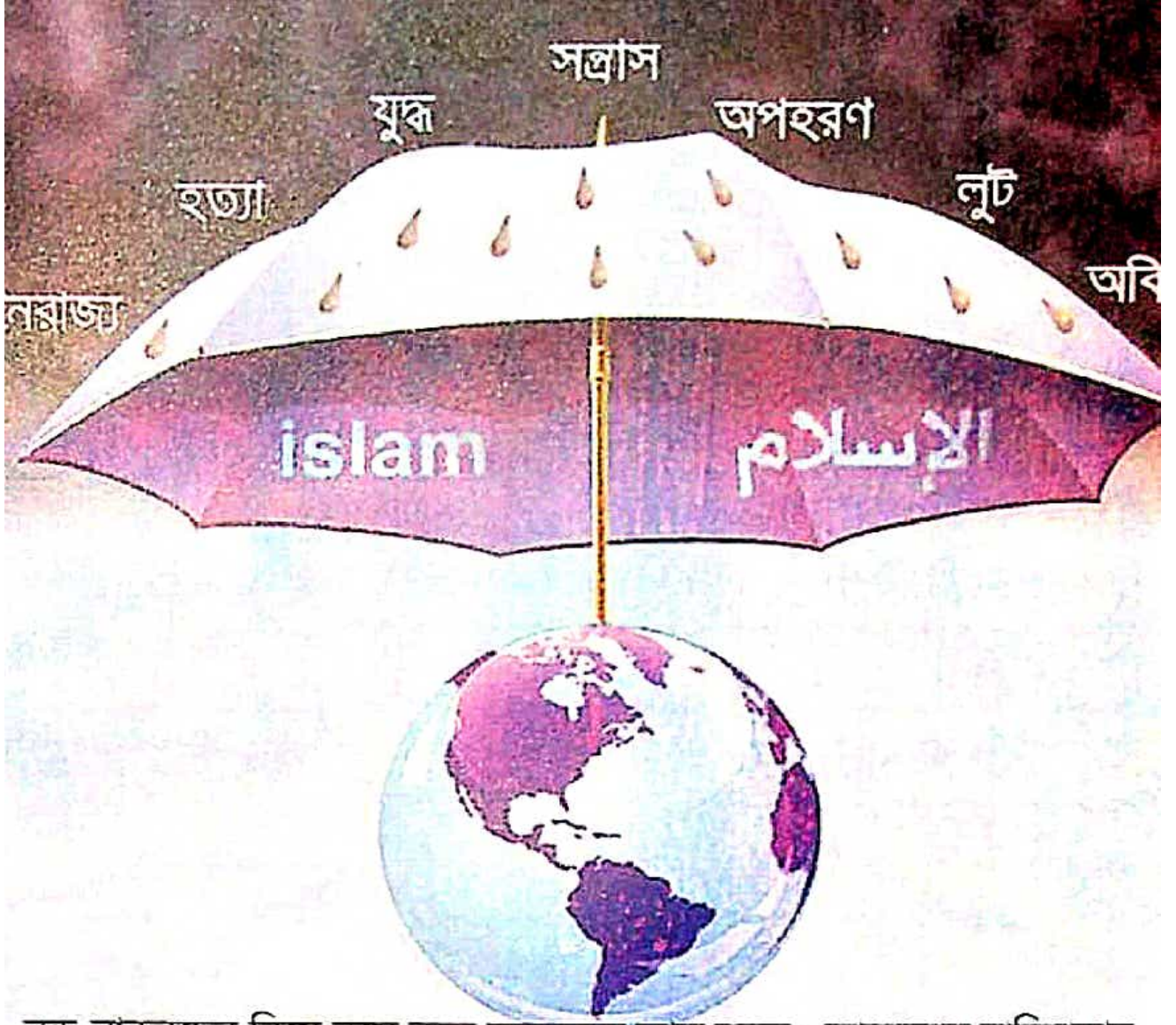
বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বসে বসে ষড়যন্ত্রের জাল বুনত। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আড়ালে বসে তাদের মজলিস শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাত যখন গড়িয়ে যেতে লাগল, আবু রাফে এর সঙ্গী-সাথিরা তখন উঠে নিজ নিজ ঘরের দিকে রওয়ানা হল। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখলেন সবাই যার যার মতো চলে গেছে, তখন তিনি আবু রাফে এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দরজাগুলো খুলে খুলে সন্তর্পণে আবু রাফে এর কামরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যখন যে দরজা খুলতেন ভিতর থেকে তা আবার লাগিয়ে দিতেন। যাতে পাহারাদাররা তাঁর আগমন সম্পর্কে জানতে পারলেও তাঁর পর্যন্ত পৌছার কোনো ব্যবস্থা না থাকে।

আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু চুপচাপ সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। আবু রাফে এর কামরার দরজা সামান্য নাড়াচাড়াতেই খুলে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বাতি ছিল নিভানো। সারা ঘর ছিল নিকষ কালো

অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দৃষ্টিশক্তিও ছিল ক্ষীণ।

তিনি ঠাওর করতে পারলেন না আবু রাফে কোন দিকে আছে। একে তো দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, অপরদিকে সারা ঘর নিকষ কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবতে লাগলেন, এখন কী উপায় করা যায়! কিছুক্ষণ পর তিনি আওয়াজ দিলেন, আবু রাফে!

আওয়াজ শুনে আবু রাফে হকচকিয়ে গেল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, কে কে! যেদিক থেকে আওয়াজ এল, আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজলীর ন্যায় সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে আবু রাফে এর উপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানলেন। আবু রাফে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। কিন্তু আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আঘাত লক্ষভ্রষ্ট হল। এতে আবু রাফে বেঁচে গেল এবং ভয়ে-আতঙ্কে সে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠল। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু [উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ভেবে] দ্রুত বাইরে বের হয়ে যেতে চাইলেন।

যখন তিনি দরজা পর্যন্ত পৌছলেন, তখন আবারও আবু রাফে এর আওয়াজ শোনা গেল। সে বিশ্রীভাবে গোঙাচ্ছিল। এতে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন, হতভাগা মরেনি; এখনও সে জীবিত। তিনি পুনরায় ফিরে এলেন– পাহারাদাররূপে। কামরাজুড়ে ছিল নিকষ কালো অন্ধকার। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের আওয়াজ পরিবর্তন করে বললেন, আবু রাফে! কী হয়েছে? আবু রাফে গোঙরিয়ে বলল, ঘরে কেউ একজন ঢুকেছে। সে আমাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছে!

আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ আবু রাফে এর আওয়াজের দিকে ছুটে গেলেন। তারপর ঝুঁকে তার উপর আরও একবার হামলা করলেন। এবার লক্ষভ্রষ্ট হল না। তলোয়ারের আঘাত গিয়ে পড়ল তার শরীরে। শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটে চলল। কিন্তু এমন ধ্বংসাত্মক হামলাতেও সে মরল না।
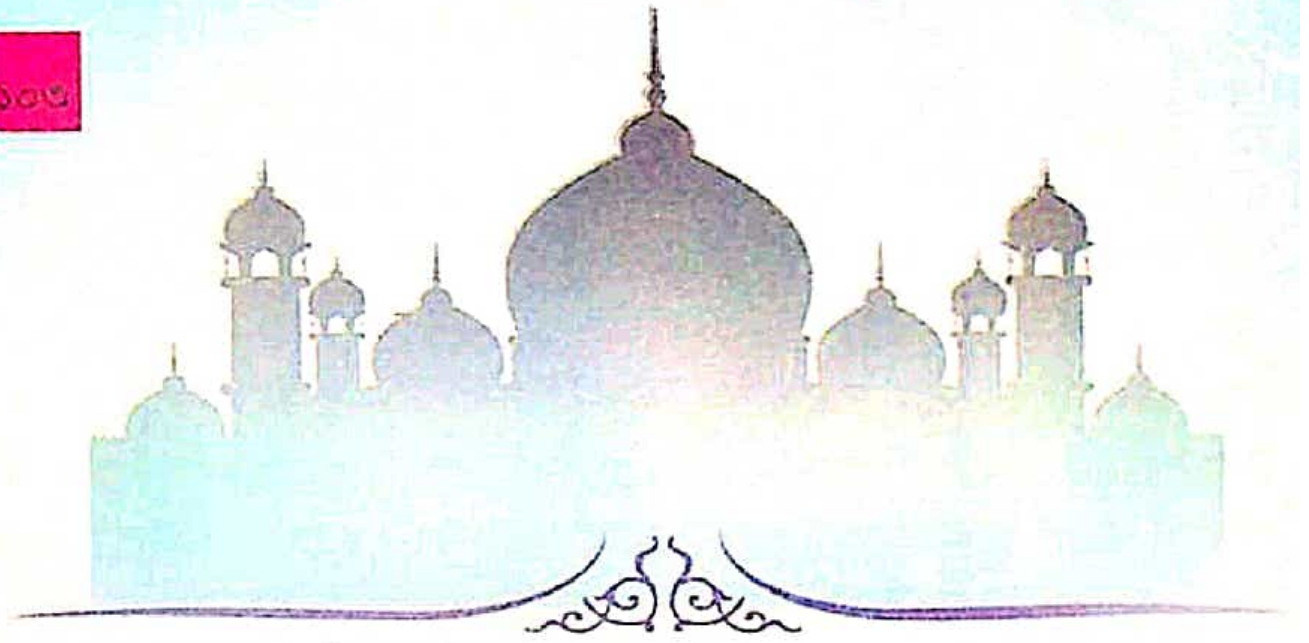
ভয়ানক আওয়াজে চিৎকার করতে লাগল।

আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে পাহারাদাররা জেগে উঠেছে। আবু রাফে তখনও চিৎকার করছিল। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও একবার ফিরে এলেন এবং আওয়াজ পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু রাফে! কী হয়েছে? এ বলে তিনি আবু রাফে এর দিকে ঝুঁকলেন এবং সর্বশক্তি দিয়ে তার পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলেন। এবারের হামলা এতটাই গভীর ছিল যে, তলোয়ার তার পেটের নাড়িভুঁড়ি কেটে কোমর দিয়ে বের হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমি তার কোমরের হাড্ডির চর্চর শব্দ শুনলাম, তখন আমি আশ্বস্ত হলাম যে, এবার ইসলামের এই দুশমনের কাজ খতম হয়েছে।

এরপর তিনি পিছনে ফিরে এসে ঘন অন্ধকারে দরজা তালাশ করতে লাগলেন। ততক্ষণে পাহারাদাররা সক্রিয় হয়ে ওঠেছে। মানুষের মাঝে হট্টগোল বেধে গেছে। দরজা খুলেই আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ডান-বাম কোনো কিছু না ভেবে সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন। তিনি একেকটি দরজা খুলছিলেন আর সামনে এগুচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে সিড়ি পর্যন্ত পৌছে গেলেন। খুব দ্রুত নীচে নামতে শুরু করলেন। তখনও তিনি ঘরের মেঝে থেকে কয়েক সিড়ি উপরে ছিলেন। অন্ধকারে তিনি ভুল বুঝলেন। সিড়ি শেষ হয়ে গেছে মনে করে সেখান থেকেই সামনে বাড়লেন। এই ভুলের কারণে তিনি বেশ উপর থেকেই মেঝেতে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লেন।

এতে তার এক পায়ের গোছা ভেঙ্গে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি মাথার পাগড়ি খুলে তা দিয়ে শক্তভাবে গোছা বাঁধলেন। এবার এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কেল্লার দরজার দিকে ছুটে চললেন।

কেল্লা থেকে যখন তিনি বের হলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ খোঁড়া। অনেক কষ্ট করে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছলেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি বললেন, আবু রাফে এর কাজ শেষ। তোমরা গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদ শোনাও। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে নড়ব না, যতক্ষণ না নিজ কানে আবু রাফে এর মৃত্যুর ঘোষণা শুনব।

জাহেলী যামানায় রেওয়াজ ছিল, যখন কওমের সরদার কিংবা কোনো সম্মানিত ব্যক্তি মারা যেত, তখন এক ব্যক্তি সকাল সকাল কোনো উচুঁ ঘরের ছাদে চড়ে মানুষের মাঝে তার মৃত্যুর ঘোষণা প্রচার করত। পাশাপাশি তার প্রশংসাসূচক কিছু কবিতাও পাঠ করত। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু চাচ্ছিলেন, যখন তিনি পরিপূর্ণরূপে আশ্বস্ত হবেন যে আবু রাফে মারা গেছে, তখনই তিনি মদীনায় ফিরবেন। অতএব, তাঁর সঙ্গীরা তাঁর জন্য একটি সওয়ারী রেখে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রাত কেটে যখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, তখন এক ব্যক্তি উচুঁ এক ভবনের ছাদে চড়ল। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু কেল্লার বাইরে থেকে তাকে দেখলিছলেন।

ওই ব্যক্তি ঘোষণা করল– 'ওহে লোকসকল! হেজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে নিহত হয়েছেন।' আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ঘোষণা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করে সঙ্গীদের পিছনে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

তাঁর সঙ্গীরা তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পৌছতে পারেননি, এরই মধ্যে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁদের বললেন, জলদি চলো! আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন।

তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পৌছলেন এবং রাসূলুল্লাহকে আবু রাফে এর হত্যার সুসংবাদ শোনালেন। আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পায়ের গোছা ভাঙ্গা ছিল। তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছিলেন। নবীজী তাঁর ভাঙ্গা গোছা দেখে বললেন, আবদুল্লাহ! গোছা সোজা কর। আবদুল্লাহ গোছা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। নবীজী তাঁর জখমের উপর স্বীয় হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন। তখনও নবীজী তাঁর গোছা থেকে হাত উঠাননি, এরই মধ্যে তাঁর জখম ভালো হয়ে গেল এবং আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনই স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে উঠে দাঁড়ালেন, যেন তিনি কখনও কোনও আঘাতই পাননি। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০৩৯, ৪০৪০ বারা ইবনে আযেব রাযি. এর সূত্রে।]

এ মু'জিযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।
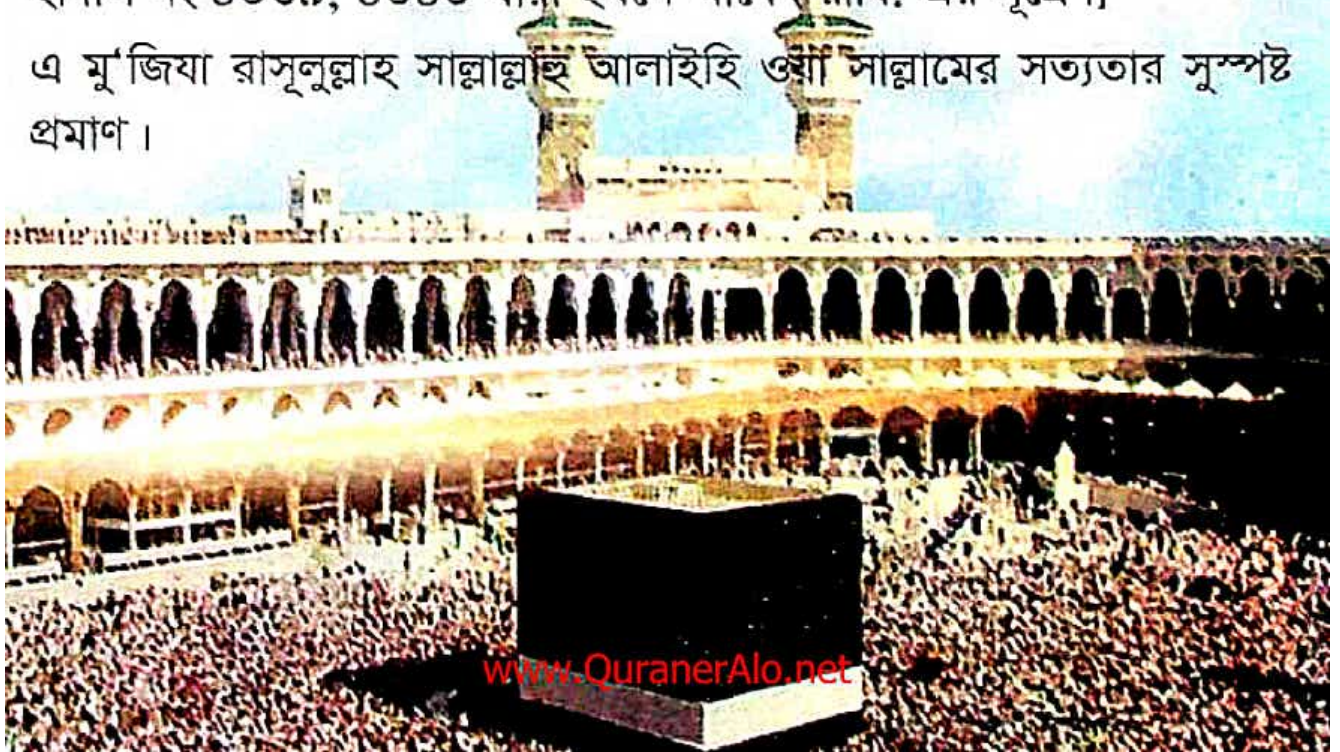
(১৬)
থুথুর বদৌলতে চোখ ভালো হয়ে গেল!

খাইবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে গাযওয়ায়ে খাইবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে খাইবার দুর্গ অবরোধ করলেন। অবরোধ দীর্ঘ হল। কিন্তু বিজয়ের কোনো আলামত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন– 'আগামীকাল ভোরে এই ঝান্ডা আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করব, যার মাথায় আল্লাহ তাআলা বিজয়ের মুকুট পরাবেন। যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে মহব্বত করেন।'

সেই রাতটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ বলে মনে হল। রাত অতিবাহিত করা তাঁদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়ল। তাঁরা ভাবনার দরিয়ায় ডুবে গেলেন। সেই অজানা ব্যক্তির সৌভাগ্যে ঈর্ষা করতে লাগলেন, সকাল হলেই যাঁকে এ মহাসম্মানে ভূষিত করা হবে। প্রত্যেকেই এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাত অতিবাহিত করলেন– আহ্! যদি এই সম্মান ও সৌভাগ্য আমার নসীব হত! ভাবতে ভাবতে রাত সকাল হল। চতুর্দিকে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশপাশে একত্র হলেন। তাঁদের বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল– নবীজী কার হাতে জানি ঝান্ডা সোপর্দ করেন!

কিছুক্ষণ পর নবীজী বললেন–

أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ؟

আলী ইবনে আবী তালিব কোথায়?

সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আলী তো চোখের পীড়ায় আক্রান্ত। তাঁর চোখ ফুলে গেছে।

ব্যথার প্রচণ্ডতায় তিনি তার চোখে কাপড় বেঁধে রেখেছেন। ফলে তিনি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। নবীজী বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু দুই ব্যক্তির সহযোগিতায় নবীজীর কাছে এলেন। ওই দুই জন তাঁর হাত ধরে রেখেছিলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বসে পড়লেন। নবীজী আপন হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর চোখ খুললেন। অতঃপর তাঁর চোখে নিজের মুখের থু থু দিলেন এবং দোয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উত্তোলন করলেন। ব্যস্, এটুকু করতে যেটুকু দেরি! ক্ষণিকের ব্যবধানেই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখ এমনভাবে ভালো হয়ে গেল, যেন তিনি সারা জীবনে কোনোদিন চোখে কোনো ব্যথাই অনুভব করেননি।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ইহুদীদের গর্দানের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত তলোয়ার চালাতে থাকব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো (মুসলমান) হয়ে যায়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও! সোজা চলে যাও! তাদের বসতি (দুর্গসমূহ) পর্যন্ত পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। তাদেরকে আল্লাহ তাআলার হক সম্পর্কে অবগত কর, যে হক তিনি তাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! তোমাদের দাওয়াতের বদৌলতে যদি একজনও হকের পথের যাত্রী হয়, তা হলে তা হবে তোমাদের জন্য আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ লাল উটের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭০১]

(১৭)

গাছের উপর প্রভাব

নবীজীর বিরহে খেজুর শাখের কান্না!

আগেকার দিনে মানুষ তাদের ঘরের ভিত্তি রাখত খেজুর গাছের ডাল, মাটি ও পাথরের উপর। তেমনি মসজিদে নববীও নির্মাণ করা হয়েছিল খেজুর-শাখা দিয়ে তৈরি স্তম্ভের উপর। তার ছাদ ছিল খেজুর-পাতায় নির্মিত।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দিতেন। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, তখন মসজিদে নববীতে হেলে পড়া খেজুরের একটি কাণ্ডের উপর ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াতেন।

একদিন এক আনসারী মহিলা নবীজীর খেদমতে নিবেদন করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এক গোলাম কাঠমিস্ত্রি। আমি কি তাকে দিয়ে আপনার জন্য একটি মিম্বার বানিয়ে দিব?

নবীজী উত্তর দিলেন, তোমার যেমন ইচ্ছা।

ওই মহিলা তার গোলামকে হুকুম দিল। গোলাম হুকুম পালন করল। একটি মিম্বার বানিয়ে দিল। মিম্বারটিকে মসজিদে নববীর শোভা বানিয়ে দেওয়া হল।

জুমার দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে তাশরীফ আনলেন। মিম্বারে পা রাখলেন। উপস্থিত লোকদের সালাম দিয়ে মিম্বারে গিয়ে বসলেন। হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ফোঁপানো কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। ধীরে ধীরে এ আওয়াজ চিৎকারে পরিণত হল। সাহাবায়ে কেরাম দৃষ্টি ওঠালেন। দেখলেন খেজুরের কাণ্ড থেকে এ কান্নার আওয়াজ ও চিৎকার ভেসে আসছে। তার ওই কান্না ও

ফোঁপানোর আওয়াজে পুরো মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বার থেকে নামলেন। খেজুরের সেই কাণ্ডের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাকে গলার সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। খেজুরের কাণ্ডটি এমনভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, যেমন ছোট বাচ্চাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। কাণ্ডটি কাঁদতে কাঁদতে এক সময় চুপ হয়ে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, এ কাণ্ডটি ওয়াজ-নসীহত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে কাঁদছে। কসম ওই সত্তার! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি আমি একে গলার সঙ্গে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা না দিতাম, তা হলে সে হাশরের দিন পর্যন্ত কাঁদতে থাকত।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৮৪, ৩৫৮৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা : ৩/১৪০, হাদীস নং ১৭৭৭]

(১৮)
গাছ হয়ে গেল পর্দা!

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজের সফর সম্পর্কে হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন– আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সফরে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে তিনি বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত এক উপত্যকায় ছাউনি ফেললেন। নবীজী প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলেন। আমি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপত্যকার আশপাশ ও দূরদিগন্তে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু পর্দা হিসেবে ব্যবহার করার মতো কোনো বস্তুই পরিদৃষ্ট হল না। উপত্যকার একদিকে দূর প্রান্তরে দুটি গাছ দেখা গেল। নবীজী সেগুলোর একটির দিকে এগিয়ে গেলেন। গিয়ে তার শাখা ধরে বললেন–

إِنْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ .

আল্লাহর আদেশে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে থাক।

গাছটি নবীজীর পিছনে পিছনে এমনভাবে চলতে শুরু করল, যেমন নাকে রশি-বাঁধা উট তার মালিকের পিছনে পিছনে চলতে থাকে। নবীজী সেটিকে নিয়ে অপর গাছটির নিকট গেলেন। তারও শাখা ধরে বললেন–

إِنْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ .

আল্লাহর আদেশে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে থাক।

সে-ও একই নিয়মে চলতে শুরু করল। যখন উভয় গাছ মাঝামাঝি এল, তখন তাদের উভয়কে এক জায়গায় করে তিনি আদেশ করলেন–

إِلْتَئِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللهِ.

আল্লাহর হুকুমে তোমরা আমার সামনে ঢাল (পর্দা) হয়ে যাও।

নবীজীর আদেশ শোনার সাথে সাথে তারা উভয়ে একসঙ্গে এমনভাবে মিলিত হয়ে ঝুঁকে পড়ল যে, উভয়ের মাঝে কোনো ফাঁক রইল না।

[হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ আমার অন্তর কেঁপে ওঠল। আমি ভয় করলাম, লাজ-লজ্জার আধার আমার মনিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না আবার প্রয়োজন সারার জন্য দূরে কোথাও চলে যান। এ ভয় মনে জাগতেই আমি সেখান থেকে চুপিসারে সরে এলাম এবং দূরে এক জায়াগায় গিয়ে বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, আমার মনিব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত সুমহান মর্যাদার অধিকারী; যাঁর লজ্জার খাতিরে গাছও তার শিকড়সমেত উঠে এসে পর্দা হয়ে যায়!

আমি তখনও এই ভাবনাতেই বিভোর ছিলাম। এরই মধ্যে কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে দেখি আমার সামনে সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর গাছের দিকে তাকিয়ে দেখি তারা আপন আপন জায়গায় গিয়ে যথারীতি দাঁড়িয়ে আছে; যেন তারা নিজেদের জায়গা থেকে কখনও নড়েইনি। [সহীহ মসলিম, হদীস নং ৩০১২]

(১৯)
পানাহার-সামগ্রীতে বরকত

পানির বরকত দেখে এক মহিলার ঈমানগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামসহ সফরে বের হলেন। আবহাওয়া ছিল খুবই গরম। মাথার উপর কাঠফাটা রোদ। পায়ের নীচে খৈ-ফোটা উত্তপ্ত বালু। সফর ছিল দীর্ঘ। দীর্ঘ সফরের এক পর্যায়ে খাবার পানি শেষ হয়ে গেল। পথে কোনে কূপও ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম পিপাসায় কাতর হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছে। কড়া রোদ ও উত্তপ্ত বালুতে সফর চালিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। এর একটা ব্যবস্থা করুন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্থানে ছাউনি ফেললেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গে আরও একজন সাহাবীকে ডেকে বললেন, তোমরা দু'জন যাও এবং পানি তালাশ কর।

তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পানি খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এক আগন্তুক মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন। মহিলা তার উটের পিঠে পানির দু'টি মশ্‌ক বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলতে পার পানি কোথায় আছে?

মহিলা উত্তর দিল– পানি এখান থেকে এতটাই দূরে যে, আমি গতকাল এ সময় সেখান থেকে পানি নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলাম, আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। আমাদের গোত্রের

পুরুষরা পিছনে আসছে।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, চলো! তুমি আমাদের সঙ্গে চলো! আগন্তুক মহিলা জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? হযরত আলী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, সেই লোকের কাছে, যে তার বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছে? অর্থাৎ যাকে লোকেরা সাবী বলে?

মক্কার মুশরিকদের কদর্যতাসমূহের একটি ছিল এই যে, তারা মক্কার বাইরে থেকে আগত লোকজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁকে 'সাবী' [বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগকারী] বলে ডাকত। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গী এই মহিলার সঙ্গে কথা বাড়ানো সঙ্গত মনে করলেন না। তাই তৎক্ষণাৎ বললেন, হাঁ হাঁ, তাঁর কাছেই চলো যাঁর কথা তুমি বলছ।

মহিলা তার উটে সওয়ার হয়ে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হল। মহিলা নবীজীর খেদমতে হাজির হলে নবীজী তাকে পানির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার ইতিবৃত্ত সব খুলে বলল এবং নিবেদন করল– আমি একজন গরিব ও অসহায় মেয়েলোক। আমার বাচ্চারা এতিম।

নবীজী তার কাছ থেকে পানির মশ্‌ক চাইলেন। তাতে স্বীয় হাত মোবারক ফেরালেন। তারপর একটি পাত্র চেয়ে আনালেন। ওই পাত্রে মশ্‌কের মুখ খুলে পানি ঢালতে শুরু করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এসো! তোমরা নিজেরা পান কর এবং নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করে নাও।

সাহাবায়ে কেরাম সকলেই নিজ নিজ পাত্র ও মশ্‌ক নিয়ে উপস্থিত হলেন। নিজেরা মন ভরে পান করলেন। অতঃপর আপন আপন পাত্র ও মশ্‌কও পরিপূর্ণ করে নিয়ে গেলেন।

সবাই পরিতৃপ্ত হলেন। সকলের মশ্‌ক ও পাত্রও পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যে যত চাইলেন পান করলেন এবং যার যত পাত্র ছিল সব ভরে নিয়ে গেলেন।

এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে মহিলা হতভম্ব হয়ে গেল। সে বিস্ময়ে হতবাক। তার মুখে কোনো রা-শব্দ নেই। সে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে দেখছিল- তার দুটি মাত্র মশ্‌কে এত পানি এল কোত্থেকে যে, মুসলমানদের সমস্ত লশ্‌কর পরিতৃপ্ত হয়ে গেল এবং সকলের যাবতীয় পাত্র পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তার বিস্ময়ের মাত্রা চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করল, যখন সে দেখল তার দুই মশ্‌কের পানি এখনও হুবহু আগের মতোই রয়ে গেছে। তা থেকে এইটি ফোঁটাও কমেনি। বরং মনে হচ্ছে যেন- পানি আগে যতটুকু ছিল এখন তার চেয়েও বেশি আছে।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগন্তুক মহিলার উপর অনুগ্রহ করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন- এ মহিলার জন্য তোমরা কিছু মাল জমা কর। ঘোষণা শুনেই সাহাবায়ে কেরাম হাদিয়া নিয়ে এসে পেশ করতে শুরু করলেন। কেউ আনলেন আজওয়া খেজুর, কেউ নিয়ে এলেন আটা। কেউ বা আবার আনলেন ছাতু। এককথায় যার কাছে যা ছিল তা-ই খুশিমনে নবীজীর সামনে এনে পেশ করলেন। দেখতে দেখতে খাদ্যদ্রব্যের স্তুপ জমে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওগুলোকে একটি গাঁটরিতে বাঁধলেন। অতঃপর তা ওই মহিলাকে দিয়ে দিয়ে বললেন, দেখো! তুমি ভালো করেই জান, আমরা তোমার পানির এক বিন্দুও কমাইনি। আমাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পানি পান করিয়েছেন।

এরপর মহিলা তার উটের লাগাম ঘুরিয়ে আপন গন্তব্যের পথ ধরল।

কিন্তু নবীজীর কথাগুলো তখনও তার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। মহিলা যথেষ্ট বিলম্ব করে তার গোত্রের লোকদের নিকট পৌঁছল। তারা তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলল– সে এক বিস্ময়কর ঘটনা! আমি আমার উটের উপর সওয়ার ছিলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ দুই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তারা আমাকে সেই লোকের কাছে নিয়ে গেল, যাকে লোকেরা সাবী বলে ডাকে। আমি সেখানে এমন এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখলাম যে, আমি একদম হতভম্ব হয়ে গেলাম! আল্লাহর কসম! দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি অবশ্যই হবে। হয়তো তিনি জাদুবিদ্যায় অদ্বিতীয়, নয়তো তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য রাসূল।

এই ঘটনার পর ওই মহিলা তার পুরো কওমসহ মুসলমান হয়ে গেছে!

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪ শব্দের ভিন্নতাসহ]

(২০)
শান্তভাবে পান কর
কেউ পিপাসার্ত থাকবে না

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও সঙ্গে ছিলেন। সফরের মাঝে পানি শেষ হয়ে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন– একদিন একরাত লাগাতার চলতে থাক। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল উদিত সূর্য তোমাদেরকে পিপাসার্ত দেখবে না। বরং তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত ও সতেজ দেখবে। সূর্যের আলো তোমাদের উপর তখনই পড়বে, যখন তোমরা পানির কাছে পৌছে যাবে।

কাফেলা চলতে থাকল। সফর দীর্ঘ হয়ে গেল। পিপাসার প্রচণ্ডতায় সাহাবায়ে কেরামের ঠোঁট ও কণ্ঠনালি শুকিয়ে এল। অবস্থা দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানির ছোট্ট একটি মশ্‌ক চাইলেন। মশ্‌ক ছিল হযরত আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে। তিনি সেটি নিয়ে এলেন। তাতে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দিয়ে ওযু করলেন; পান করলেন। তারপরও পানি বেঁচে গেল। নবীজী আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, এ মশ্‌ক হেফাজত করে রেখো। এ থেকে অচিরেই আশ্চর্যজনক এক ঘটনা ঘটবে।

কাফেলা পুনরায় রওয়ানা হল। চলতে চলতে সূর্য মাথার উপর উঠে এল। দুপুরের সময়। প্রচণ্ড গরম। মাথার উপর কাঠফাটা রোদ। পায়ের নীচে উত্তপ্ত মরুভূমি। সব কিছুই যেন আগুন হয়ে আছে। লোকজন ফরিয়াদ করতে শুরু করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম! পিপাসা আমাদেরকে শেষ করে দিল!
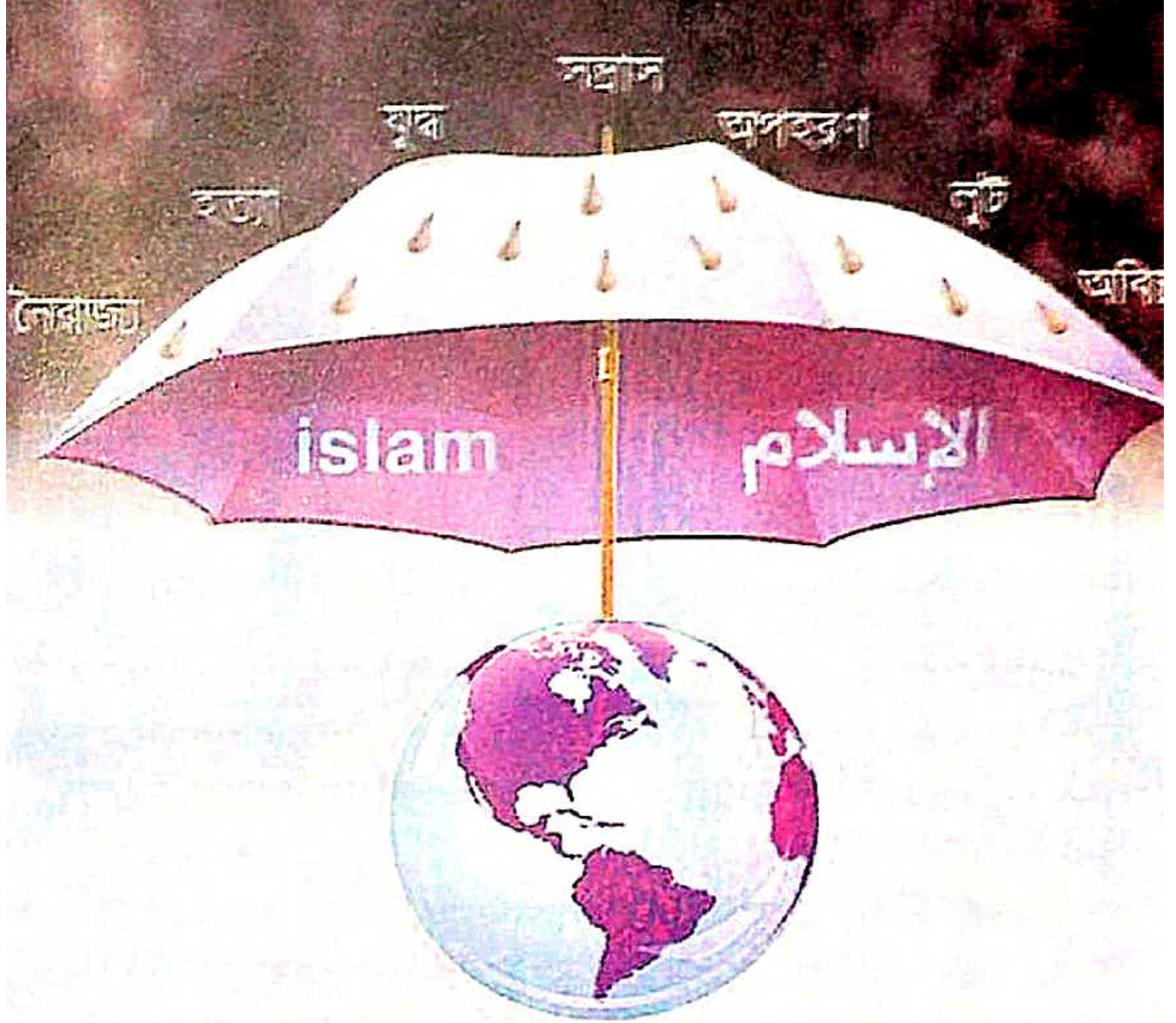
আর কিছুক্ষণের মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–

لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ .

তোমরা ধ্বংস হবে না।

অতঃপর বললেন, আমার ওযুর পাত্র আন। পাত্র আনা হল। আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হুকুম দিলেন, মশ্‌ক নিয়ে এসো। আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু মশ্‌ক এনে নবীজীর খেদমতে হাজির করলেন। খুব সামান্যই পানি ছিল তাতে। মশ্‌কটি নবীজী নিজের হাতে নিলেন। তার মুখ খুললেন। তারপর সেটি উল্টিয়ে স্বীয় ওযুর পাত্রে পানি ঢালতে শুরু করলেন। পানি দেখে সাহাবায়ে কেরাম পানির কাছে জড়ো হতে লাগলেন। এক পর্যায়ে ভীড় এত বেশি বেড়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বলে তাগিদ করতে হয়েছে যে–

أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى .

তোমরা শান্তভাবে পান কর। কেউ তৃষ্ণার্ত থাকবে না।

নবীজী পাত্রে পানি ঢালছিলেন আর আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকজনকে পান করাচ্ছিলেন। সবাই মন ভরে পান করলেন। যাদের কাছে পাত্র ছিল, তারা পাত্রও ভরে নিলেন। এবার আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ বাকি নেই। ভীড় সেরে যাওয়ার পর নবীজী আবারও পানি ঢাললেন এবং আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন–

إِشْرَبْ .

তুমিও পান কর।

আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিবেদন করলেন, আমার মনিব! আপনি আগে পান করুন। তারপর আমি পান করব। আমি আপনার আগে পান করতে পারি না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে পান করায় সে সবার শেষেই পান করে।

আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর আমি পান করলাম। আমার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান করলেন। তিনশ' সাহাবীর মধ্যে একজনও পিপাসার্ত থাকলেন না। সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮১, মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৯৮]
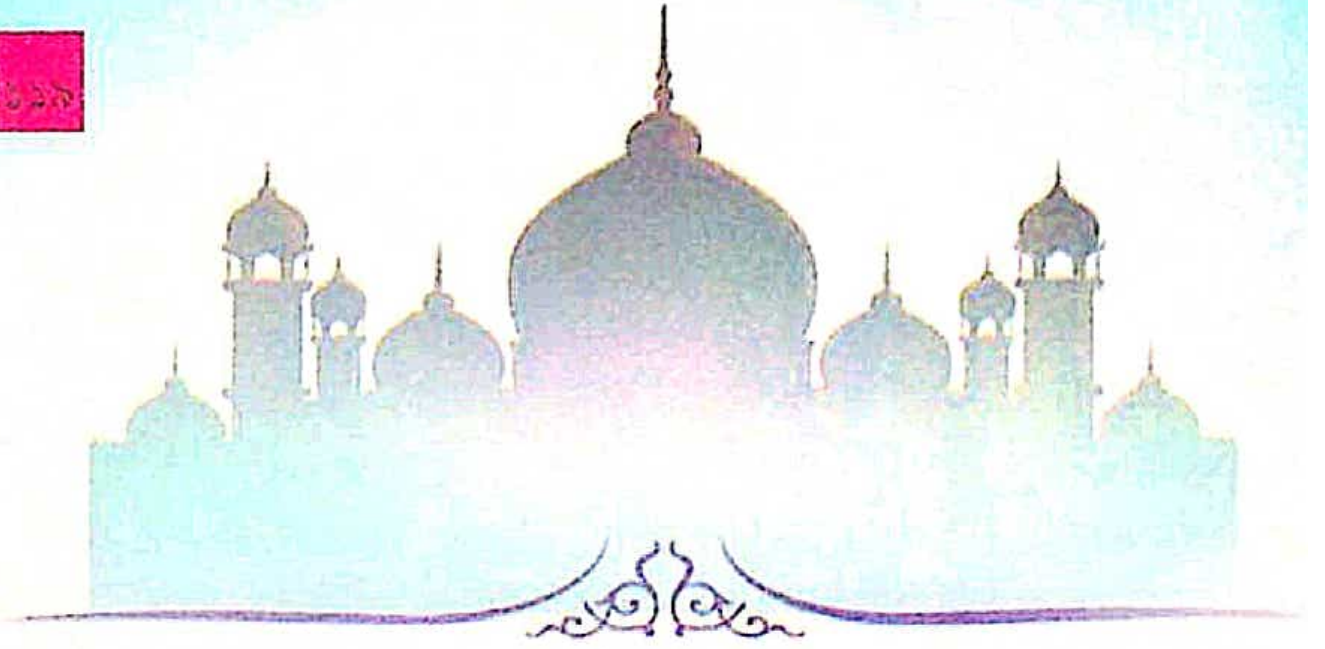
(২১)

গায্‌ওয়ায়ে তাবুকে প্রচণ্ড পিপাসা

গায্‌ওয়ায়ে তাবুকের প্রতিটি বিষয়ই ছিল বিস্ময়কর অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি। ওই সফরে মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একদিকে পথের দূরত্ব অনেক বেশি, অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অনেক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর ও আসরের নামায একসঙ্গে আদায় করেছেন। অতঃপর মাগরিব ও ইশার নামাযও একসঙ্গে আদায় করেছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন– ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তোমরা তাবুকের জলধারায় গিয়ে পৌঁছবে। ততক্ষণে সূর্য তোমাদের মাথার উপর উঠে আসবে। তোমাদের যে-ই সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সে যেন ততক্ষণ পর্যন্ত নালার পানিতে হাত না দেয়, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেখানে পৌঁছি।

কাফেলা এগিয়ে চলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছার আগেই দু'জন সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নালায় পানি ছিল খুব কম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি এ থেকে পানি পান করেছ?

তারা উত্তর দিলেন, জি হাঁ।

নবীজী তাদের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, আমি তো আগেই ঘোষণা করে সকলকে এ থেকে পানি পান করতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। তারপরও কেন তোমরা পানি পান করলে? তারপর আল্লাহ যা চাইলেন, নবীজী তাদেরকে তা-ই বললেন।

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন প্রচণ্ড পিপাসার্ত। নবীজী এক সাহাবীকে আদেশ দিলে তিনি ছোট্ট একটি পাত্রে করে নালা থেকে পানি নিয়ে এলেন। নবীজী তা দিয়ে নিজের হাত ও চেহারা মোবারক ধুলেন। তারপর ওই পানি পুনরায় নালায় ফেলে দিলেন। এই বরকতময় পানি নালার পানির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নালা থেকে পানির ফোয়ারা ছুটে চলল। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই তৃপ্তিসহকারে পান করলেন। ওযু করলেন এবং নিজেদের পাত্রসমূহ ভরে নিলেন।

তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে তাকিয়ে বললেন, মুআয! আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা হলে তুমি দেখবে– এই নালার পানি এত বেশি বেড়ে যাবে যে, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সয়লাব করে দিবে।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০৬ পরবর্তী হাদীস নং ২২৮১]

(২২)

খাবারে বরকত

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আমরা খন্দক খনন করছিলাম। খনন করতে করতে হঠাৎ একটি বৃহদাকারের পাথর আমাদের সামনে দেখা গেল। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সুবিশাল এক পাথর আমাদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চলো! আমি নিজেই তোমাদের সাথে যাচ্ছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরারেম সঙ্গে চলতে শুরু করলেন। প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। তিনদিন পর্যন্ত আমরা একটি লোকমাও খাইনি। নবীজী এই অবস্থায়ই কোদাল হাতে তুলে নিলেন এবং অতিকায় পাথরের উপরের আঘাত করলেন। এতে পাথরটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এক পর্যায়ে আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। নবীজী অনুমতি দিলেন। আমি বাড়ি গেলাম। স্ত্রীকে বললাম, আমি নবীজীকে এতটাই ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখে এসেছি যে, তাঁর এ অবস্থা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

স্ত্রী বললেন, ঘরে শুধুমাত্র এক সা' (দুই কিলো একশ' গ্রাম) যব ও ছোট্ট একটি বকরির বাচ্চা আছে।

আমি তৎক্ষণাৎ বাচ্চাটি জবাই করলাম। এরই মধ্যে স্ত্রী আটা খামির করে ফেললেন। আমি গোশ্‌ত হাড়িতে ঢেলে দিয়ে দ্রুত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী বললেন, রাসূলুল্লাহকে সকলের সামনে দাওয়াত দিয়ে আমাকে লজ্জিত করবেন না! [জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আমি অত্যন্ত দ্রুত নবীজীর কাছে গেলাম এবং সকলের অলক্ষ্যে খুব নীচু আওয়াজে চুপিসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিবেদন করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সামান্য খাবার প্রস্তুত। চলুন! দু' এক জন সাথী নিয়ে আমার সঙ্গে তাশরীফ রাখুন এবং খানা খেয়ে আসুন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, খাবারের পরিমাণ কেমন? আমি পরিমাণ জানালে নবীজী বললেন, অনেক! অতঃপর তিনি উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করলেন– খন্দকবাসী! জাবের তোমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেছে। এসো! সবাই এসো! তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বল– আমি আসা পর্যন্ত সে যেন চুলা থেকে হাড়ি না নামায় এবং তন্দুর থেকে কোনো রুটি বের না করে।

ঘোষণা শুনে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ নবীজীর সঙ্গে হযরত জাবেরের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। ওদিকে হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন– ওহে ভাগ্যবতী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সকল সাথিদের নিয়ে আসছেন! স্ত্রী বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে বুদ্ধি দান করুন! এ আপনি কী করেছেন?

তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দী! আমি তো সেভাবেই দাওয়াত দিয়েছি, যেভাবে তুমি বলেছ। কিন্তু নবীজী সকলকেই দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছেন।

জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আটা বের করলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে নিজের থুথু দিলেন এবং বরকতের

জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি হাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাতেও তিনি থুথু দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যারা রুটি বানাবে তারা রুটি বানাতে থাকবে আর তোমরা হাড়ি চুলার উপর থেকে না নামিয়েই তা থেকে গোশ্‌ত বের করে করে পেয়ালায় দিতে থাকবে। হাড়ি নীচে নামাবে না।

[হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] এক হাজার সাহাবী ছিলেন। আল্লাহর কসম! সমস্ত সাহাবী পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। তা সত্ত্বেও খানা বেঁচে গেল। আমাদের হাড়ি তখনও তরকারিতে পূর্ণই ছিল এবং ঠিক সেভাবেই টগবগ করছিল, যেমন নবীজী আসার পূর্বে টগবগ করছিল। ওদিকে রুটি প্রস্তুতকারীগণও রুটি বানাচ্ছিল। না আটায় কোনো কমতি এল না তরকারিতে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪১০১, ৪১০২]

(২৩)
আবু হুরায়রা! আরও পান কর

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওই সত্তার কসম! যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আমি আমার জীবিকা নির্বাহের চিন্তা-ফিকির সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিনরাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পড়ে থাকতাম। যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত কোনো বাণী থেকে আমি বঞ্চিত না হয়ে যাই। এ কারণে কখনও কখনও ক্ষুধা আমাকে অনেক কষ্ট দিত। এমনকি কোনো কোনো সময় আমি কাতর হয়ে মসজিদের নববীর খাম্বার পাশে ঢলে পড়তাম। কোনো অতিক্রমকারী সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে বলত– আবু হুরায়রার ব্যরাম হয়েছে। অথচ আল্লাহর কসম! কোনো রোগের কারণে তখন আমার এ অবস্থা হত না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমি স্থির থাকতে পারতাম না; দেহের ভাড় বহন করতে পারতাম না।

একদিন আমার ক্ষুধা চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করল। আমি আর পারলাম না। একান্তই বাধ্য হয়ে সাহাবায়ে কেরামের চলাচলের পথে বসে পড়লাম। সর্বপ্রথম ওই পথে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অতিক্রম করলেন। আমি দাঁড়িয়ে তাঁকে থামালাম। তারপর কুরআনে কারীমের ওই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে আয়াতে ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য ছিল– তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন এবং খাবার খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না। তিনি আপন পথে চলে গেলেন। আমি নিরাশ হয়ে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন। আমি তাঁকেও ওই আয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করলাম। উদ্দেশ্য সেটাই। ভেবেছিলাম, তিনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন এবং আমাকে খাবার খাওয়াতে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু তিনিও আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন না। তিনিও চলে গেলেন। আমি আবারও হতাশ হয়ে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর ওই একই পথে এলেন দয়ার নবী মায়ার নবী রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আমাকে দেখেই একটি মুচকি হাসি দিলেন। আমার মনের কথা এবং চেহারার ভাব– সবই তিনি বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে ডাকলেন, আবু হুরায়রা! আমি নিবেদন করলাম, আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, চলো! এটুকু বলেই তিনি চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। নবীজী তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম।

নবীজীর সামনে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হল। জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ কোত্থেকে এসেছে? উত্তর এল, হাদিয়া এসেছে। নবীজী আমাকে ডাকলেন– আবু হুরায়রা! আমি নিবেদন করলাম, আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আসহাবে সুফ্‌ফার কাছে যাও এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে এসো!

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আসহাবে সুফ্‌ফা' ইসলামের মেহমান। দূর-দূরান্ত থেকে ইসলামী তালীম শিক্ষালাভের জন্য তাঁরা এসেছিলেন। এখানে তাঁদের না কোনো সহায়-সম্পত্তি ছিল, আর না ছিল পরিবার-পরিজন।

নবীজীর কাছে সদকার কোনো মাল এলে তার সবই আসহাবে সুফ্‌ফার জন্য পাঠিয়ে দিতেন; নিজে কিছুই রাখতেন না।

আর যখন কোনো হাদিয়া আসত, তখন তিনি আসহাবে সুফ্ফাকে ডেকে পাঠাতেন। তাঁরা এলে তাঁদের সঙ্গে বসে নিজেও খেতেন।

নবীজী যখনই আমাকে আসহাবে সুফ্ফাকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিলেন, তখনই আমার আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম, একদিকে এই ছোট্ট একটি দুধের পেয়ালা, অপরদিকে আসহাবে সুফ্ফার সদস্যরা! এই যৎসামান্য দুধে এত লোকের কী হবে! উত্তম তো হত যদি পুরো পেয়ালার দুধটুকু আমি একা খেতে পারতাম। এতে আমার দুর্বল দেহে কিছুটা হলেও প্রাণের সঞ্চার হত। আসহাবে সুফ্ফা এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হুকুম দিবেন– যাও! আবু হুরায়রা! এদের সবাইকে দুধ পান করাতে শুরু কর। আর আমি এক এক করে সবাইকে দুধ পান করাতে থাকব। এভাবে আমার পালা আসতে আসতে পেয়ালায় দুধের একটি ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না।

তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি ওঠলাম। আসহাবে সুফ্ফার নিকট গেলাম। তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে এলাম। তাঁরা এসে নবীজীর কাছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবীজী অনুমতি দিলেন। তাঁরা সকলে এসে নিজ নিজ জায়গায় বসে গেলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু হুরায়রা! আমি নিবেদন করলাম, আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, পেয়ালা নাও এবং সবাইকে পান করাতে শুরু কর। আমি পেয়ালা উঠালাম এবং পান করাতে শুরু করলাম।

প্রথম জনকে দিলাম। তিনি খুব পান করলেন। পরিতৃপ্ত হলেন। অতঃপর পেয়ালা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি দ্বিতীয় জনকে দিলাম। তিনিও মন ভরে পান করলেন এবং পেয়ালা ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তৃতীয় জনকে দিলাম। তিনিও খুব পান করলেন অতঃপর পেয়ালা ফিরিয়ে দিলেন। দুধ পান করাতে করাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছলাম। আহলে সুফ্ফার সকলেই তৃপ্তিসহকারে মন ভরে দুধ পান করলেন।

এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেয়ালা নিজের হাতে নিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আবু হুরায়রা! আমি বললাম, আমি হাজির ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, এখন কেবল আমি আর তুমিই বাকি। অন্যরা সবাই পান করেছে। আমি বললাম–

صَدَّقْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!

আল্লাহর রাসূল! আপনি সত্য বলেছেন।

তিনি বললেন, যাও! তুমিও বসে পড় এবং পান কর। [আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আমি পান করতে শুরু করলাম। পরিতৃপ্ত হয়ে পেয়ালা ফিরিয়ে দিতে গেলাম। নবীজী বললেন, আবু হুরায়রা! আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। নবীজী তেমনই বলতে লাগলেন– আবু হুরায়রা! আরও পান কর। এক পর্যায়ে আমি নিবেদন করলাম, যথেষ্ট হয়েছে ইয়া রসূলাল্লাহ! ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যথেষ্ট পান করেছি আমি। এখন আর আমার পেটে এক ঢোকও পান করার মতো জায়গা নেই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা তবে আমাকে দাও। আমি পেয়ালা তাঁর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধটুকু পান করলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫২ বিভিন্ন শব্দে, শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকী : ৭/৩৮৬]

(২৪)
গায়েবী মদদ

ফেরেশ্‌তা হল দেহরক্ষী

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন যুবককে দেখেছি। তারা নবীজীকে রক্ষা করতে অপ্রতিরোধ্য ঝড়ের ন্যায় লড়াই করছিল। আমি তাদেরকে সেদিনের আগে ও পরে আর কোনোদিন দেখিনি। তাঁরা দু'জন ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩০৬]

(২৫)

বিদ্রূপকারীদের জন্য আমিই যথেষ্ট!

নবীজীর সঙ্গে বেয়াদবির দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি!

কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে দুস্কৃতিকারী একটি দল ছিল। এ দুরাচারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া, তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। তারা হল–

১. ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা।

২. আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব

৩. আসওয়াদ ইবনে আব্‌দে ইয়াগূস।

৪. হারেস ইবনে আইতাল।

৫. আস্ ইবনে ওয়ায়েল সাহ্‌মী।

একদিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন। উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের দেওয়া কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে নবীজী জিবরাঈলের নিকট তাদের নামে অভিযোগ করলেন। এর কিছুক্ষণ পরই সেখান দিয়ে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা অতিক্রম করল। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তার জন্য যথেষ্ট। তারপর দেখা গেল আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিবকে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার চোখের দিকে ইশারা

বললেন, আমি তার জন্য যথেষ্ট। তারপর এল আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগূস। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার মাথার দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তার জন্য যথেষ্ট। তারপর দেখা গেল হারেস ইবনে আইতালকে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার পেটের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তার জন্য যথেষ্ট। সবশেষে দেখা গেল আস্ ইবনে ওয়ায়েলকে। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার পায়ের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তার জন্য যথেষ্ট।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে শুরু করলেন। তারা ঠিক সেভাবেই ধ্বংস হতে লাগল, যেভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা একদিন খুযাআ গোত্রের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওই গোত্রেরই একজন তার তীর-ধনুক ঠিক করছিল। হঠাৎ লোকটির হাত থেকে একটি তীর ফস্কে গিয়ে ওয়ালীদের আঙ্গুলে লাগল। এতে তার আঙ্গুল কেটে গিয়ে জখম হয়ে গেল। জখমের আঘাতে কিছুদিন সে ছট্ফট্ করতে করতে মারা গেল।

আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব একদিন তার সন্তানদের সাথে গাছের নীচে বসে ছিল। হঠাৎ সে অজানা কারণে চিৎকার করে বলতে লাগল– 'আমার ছেলেরা! আমাকে বাঁচাও! আমি মরে যাব!' তার ছেলেরা বলল, কী হয়েছে? আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সে আবারও বলল, 'আমি মরে যাব! তাকে থামাও! সে আমার চোখে কাঁটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

আসওয়াদ এভাবেই চিৎকার করে করে আর্তনাদ করছিল আর তার সন্তানরা একই জওয়াব দিচ্ছিল– কই, আমরা তো এখানে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

অবশেষে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। আর এ অবস্থায়ই সে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেল।

আসওয়াদ ইবনে আব্‌দে ইয়াগূসের মাথায় হঠাৎ বড় বড় ফোঁড়া বের হতে শুরু করল। তার সারা মাথাই জখমে ভর্তি হয়ে গেল। এই রোগে আক্রান্ত হয়েই সে মারা গেল।

হারেস ইবনে আইতালের পেট অজানা কারণে হলুদ রঙের পানিতে ভরে গেল। তার পেট ফুলে-ফেঁপে ওঠল। পেটের ময়লা তার মুখ দিয়ে বের হতে শুরু করল। এই ভয়ংকর রোগে ভুগে ভুগে সে মারা গেল।

বাকি রইল আস্‌ ইবনে ওয়ায়েল। সে একদিন তার গাধায় চড়ে তায়েফে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার গাধা এক কাঁটাদার ঝোঁপে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। এতে বিরাট একটি কাঁটা তার পায়ে বিঁধে গেল। সে ওই কাঁটার বিষে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মারা গেল। [আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী : ৯/৮]

এভাবে এক এক করে সকল বেয়াদবই স্বীয় পরিণতি বরণ করে নিল। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন–

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.

নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট।

[সূরা হিজ্‌র : ৯৫]

(২৬)
লণ্ডভণ্ড কাফের বাহিনী

মুসলমানদের নাম-নিশানা ও মদীনার অস্তিত্ব চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য হাজারো কাফের একত্র হয়েছিল জঙ্গে আহ্যাব-এ। তারা মদীনার একেকটি ইট খুলে নেওয়ার জঘন্য মানসিকতা নিয়ে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম তাদের মোকাবিলায় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করেন এবং দুশমনদেরকে তাদের অসৎ সংকল্পসহ নিশ্চিহ্ন করে দেন। তাদের মৃত্যুতে না আকাশ কাঁদে, না জমিন তাদের বিচ্ছেদে আফসোস করে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেছেন–

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا .

অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং (ফেরেশ্তাদের) এমন বাহিনী প্রেরণ করলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। [সূরা আহ্যাব : ৯]

আহ্যাবের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের উপর এমন ঝড়-তুফান প্রেরণ করেছেন, যা তাদের আগুনসমূহ নিভিয়ে দিয়েছে; হাড়ি-পাতিল উল্টে দিয়েছে; তাদের তাবু ও খিমা উপড়ে ফেলেছে; স্থাপনাকে জীর্ণ করে দিয়েছে; তাদের ঘোড়াসমূহ ভাগিয়ে দিয়েছে; উটসমূহ বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর ফেরেশ্তাদের বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেছেন, যাদেরকে চোখে দেখা যেত না। তারা ইসলামের দুশমনদের উপর হামলা করে তাদেরকে একদম নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। তাদের সম্মিলিত বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। ফলে মদীনার আশপাশ থেকে ঘেরাও-অবরোধ সব শেষ হয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর সেই অনুগ্রহের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا .

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

[সূরা আহ্‌যাব : ৯]

উল্লেখ্য : খন্দক যুদ্ধের আরেক নাম জঙ্গে আহ্‌যাব তথা আহযাবের যুদ্ধ। সারা আরবের সমস্ত কুফরি শক্তি এক হয়ে বিশাল এক সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে মুসলমানদের নাম-নিশানা ও মদীনার অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ৫ম হিজরীতে মদীনার চারপাশে অবরোধ কায়েম করেছিল।

(২৭)
বৃষ্টির সাহায্য

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর বড় দয়া করেছেন; বহুভাবে তাঁদের সাহায্য করেছেন। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই কম। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য উপায়-উপকরণও ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। কারও কাছে বর্ম ছিল তো তলোয়ার ছিল না। আবার কারও কাছে তলোয়ার ছিল তো দুশমনের আক্রমণ থেকে রক্ষার ঢাল ছিল না। অপরদিকে মক্কার মুশরিকদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। উপরন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াইয়ে তারা ছিল অত্যন্ত পটু ও পারদর্শী। যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধ-কৌশল ছিল তাদের নখদর্পনে।

মক্কার মুশরিকরা বদর প্রান্তরে আগে পৌঁছার সুবাদে সমতলভূমি ও শক্তমাটির অংশে তাদের ঘাটি গেড়ে নিল। আর মুসলমানদের ভাগে যে অংশ পড়ল, তাতে অধিক পরিমাণে বালু থাকার কারণে পা স্থির থাকত না, বরং পা জমিনে ঢুকে যেত। এতে মুসলমানরা পেরেশান হলেন। অপরদিকে শয়তান তাঁদের অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা চাইলেন না। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। ফলে মুসলমানরা যেদিকে ছিলেন, সেদিককার মাটি জমে গেল এবং তাদের পা স্থির হল। পাশাপাশি তাদের অন্তর থেকে শয়তানের দেওয়া কুমন্ত্রণাও দূর হয়ে গেল। মুসলমানরা মন ভরে পানি পান করলেন। গোসল করলেন। পবিত্রতা অর্জন করলেন। একদম সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে গেলেন। এ বৃষ্টি ছিল মুসলমানদের জন্য এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত; মহান দাতার পক্ষ থেকে অপার রহমত। অপরদিকে মুশরিকদের জন্য তা হয়ে দাঁড়াল মহাবিপদের কারণ। কাফেরদের পা নড়বড়ে হয়ে গেল। কারণ,
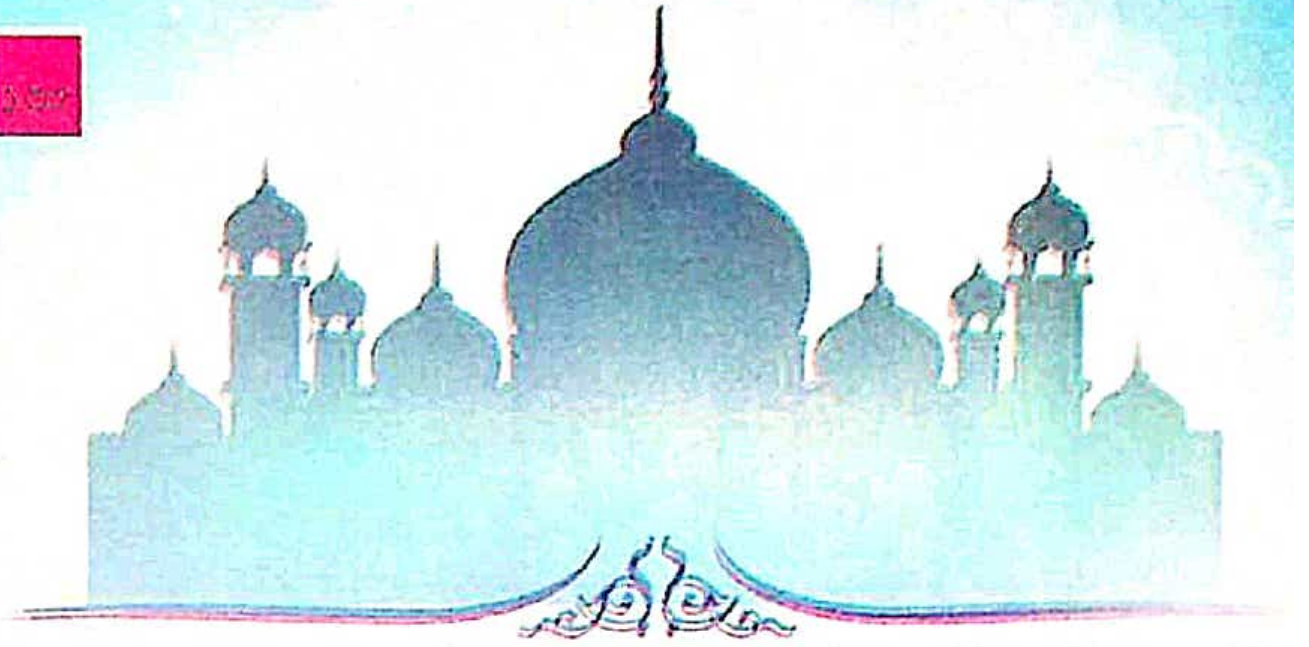
তারা যে জায়গা দখল করেছিল, তা ছিল এঁটেল মাটির। বৃষ্টির পানি পড়তেই তা কাদায় পরিণত হয়ে গেল। তারা অত্যধিক ভোগান্তি ও দুর্গতির সম্মুখীন হল। অপরদিকে মুসলমানদের অধিকারকৃত স্থান বৃষ্টির পানি পড়ে মজবুত ও লড়াইয়ের উপযোগী হয়ে গেল; ধুলাবালির নাম-নিশানাও রইল না। এ এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.

[স্মরণ কর ওই সময়ের কথা] যখন তিনি তোমাদের উপর তার পক্ষ থেকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা আরোপ করেছিলেন তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করছিলেন, যাতে তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলোকে। [সূরা আনফাল : ১১]

(২৮)

দম্ভচূর্ণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেফাজত করা ও নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এটিও নবীজীর নবুওয়তের সত্যতার একটি প্রমাণ। যেমন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ .

অতএব, (হে মুহাম্মাদ!) তোমাকে যা আদেশ করা হয়, তুমি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দাও এবং মুশরিকদের কোনো পরোয়া করো না। বিদ্রূপকারীদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট, যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব, অতিসত্বর তারা জানতে পারবে।

[সূরা হিজ্‌র : ৯৪-৯৬]

এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সামনের এই ঘটনাটি, যা ঘটেছিল এই উম্মতের ফেরআউন আবু জাহ্‌লের সাথে। আবু জাহ্‌ল ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও দাম্ভিক।

একদিন সে কাবার কাছে তার সাথি-সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ কি তার কুৎসিত চেহারা নিয়ে তোমাদের সামনে বের হয়? তারা জওয়াব দিল, হাঁ। আবু জাহ্ল ক্রোধে ফেটে পড়ল। সে বলতে লাগল– 'লাত-উজ্জার কসম! যদি আমি তাকে এদিক দিয়ে অতিবাহিত হতে দেখি, তা হলে তাকে নীচে ফেলে আমি তার গর্দানে চড়ে বসব এবং তার গর্দান পিষে ফেলল। সে ধ্বংস হোক। সে কতই না বদস্বভাব ও কুৎসিত চেহারার।'

আবু জাহ্ল তখনও এ জাতীয় অশোভন কথা বলেই চলছিল। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। নবীজী খুব শান্তভাবে কাবার কাছে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করলেন। অতঃপর সেজদায় গিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে বিনয়-বিগলিত হয়ে দোয়া করতে লাগলেন।

আবু জাহ্লের জন্য এ দৃশ্য ছিল এক চ্যালেঞ্জ। কেননা, সে এইমাত্র তার সঙ্গীদের সাথে কসম করে বলেছে– 'আমি মুহাম্মাদকে এমন শিক্ষা দিব, যা তার জীবনভর স্মরণ থাকবে।'

অতএব, আবু জাহ্ল দম্ভভরে ও সজোরে জমিনে পদাঘাত করতে করতে নবীজীর দিকে এগিয়ে চলল। সে ভাবছিল, খুব সহজেই আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গর্দানের উপর চড়ে বসব এবং তাকে পিষ্ট করে ফেলব।

কারণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সেজদাবনত ছিলেন। সে নবীজীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সে বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠল এবং হাত দিয়ে নিজের মুখ থেকে কিছু একটা সরাতে সরাতে উল্টোদিকে ছুটে চলল। সে তার সাথি-সঙ্গীদের কাছে পৌছতে পৌছতে তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেল। তার চেহারার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার এ দুরাবস্থা দেখে সাথি-সঙ্গীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আবু জাহ্‌ল! কী হয়েছে?

আবু জাহ্‌ল কুকুরের মতো জিহ্বা বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল– আমার মাঝে ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের বিশাল এক গর্ত এবং পাখাবিশিষ্ট ভয়ঙ্করদর্শন এক প্রাণী এসে দাঁড়াল। সে আমার উপর তুফানের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ল। আমি যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে বললেন–

لَوْ دَنَا مِنِّيْ لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا .

সে যদি আমার নিকটবর্তী হত, তা হলে ফেরেশ্‌তারা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিত (এবং তার একেকটি অঙ্গকে টুকরো টুকরো করে মক্কার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে দিত।) [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৯৭]

তখনই আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন–

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى * كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ .

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে; এক বান্দাকে, যখন সে নামায পড়ে? তুমি কি দেখেছ, যদি সে সৎপথে থাকে; অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়; তুমি কি দেখেছ, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়; সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন। কখনোই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তা হলে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই– মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক; আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। কখনোই নয়, তুমি তার আনুগত্য করো না; তুমি সেজদা কর ও আমার নৈকট্য অর্জন কর। [সূরা আলাক : ৯-১৯]

(২৯)

ধরতে এসে নিজেই ধরা!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় যাচ্ছিলেন, তখনকার ঘটনা। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে এনে দেওয়ার জন্য বিরাট অংকের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বহু লোক ওই পুরস্কারের লোভে নবীজীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। সুরাকা ইবনে মালেকও তাদের একজন। অন্যান্যদের মতো সে-ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

[এক স্থানে গিয়ে সে নবীজীর সন্ধান পেয়েও গেল।] সুরাকা নবীজী ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ধরার জন্য উল্কাবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। ক্রমেই সে তাঁদের নিকটবর্তী হচ্ছে। সে একেবারেই কাছাকাছি পৌছে গেলে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! নবীজী বললেন–

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا .

(আবু বকর!) পেরেশান হয়ো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। [সূরা তাওবা : ৪০]

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকার জন্য বদদোয়া করলেন। বদদোয়ার ফলে সুরাকার ঘোড়ার পা হঠাৎ জমিনে ঢুকে গেল এবং

এই পরিমাণ ঢুকে গেল যে, ঘোড়ার পেট জমিনের সঙ্গে লেগে গেল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে অনেক চেষ্টা করল; হাত-পা ছোড়াছুড়ি করল। কিন্তু কোনোই লাভ হল না। অবশেষে সে নবীজীর কাছে ফরিয়াদ করে বলল– আমি জানি আপনি আমার জন্য বদদোয়া করেছেন। দয়াকরে আপনি আপনার প্রভুর নিকট দোয়া করুন, যাতে তিনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যদি আমি এই বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাই, তা হলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি– এরপর থেকে আপনার দিকে ধাবমান যাবতীয় বিপদ-আপদ ও তুফানের বিরুদ্ধে আমি অপ্রতিরোধ্য পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াব; আমি কাউকেই আপনার পর্যন্ত পৌঁছতে দিব না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে সে মক্কার দিকে ফিরে চলল। পথিমধ্যে যার সঙ্গেই তার সাক্ষাৎ হত, সে তাকেই বলত– এদিকে যেয়ো না। এদিকে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে এসেছি। সেখানে তোমরা কাউকে পাবে না। সুরাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসন্ধানকারী সবাইকেই এ কথা বলছিল যে, মুহাম্মাদকে এদিকে তালাশ করে লাভ নেই। অন্য কোথাও যাও এবং সেদিকে তালাশ কর।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৫ শব্দের ভিন্নতাসহ]

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে কাফের-মুশরিকদের নিকৃষ্ট সংকল্প থেকে রক্ষা করলেন। কারণ, নবীজীকে রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়নে সত্যবাদী। তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

আর আল্লাহ তোমাকে মানুষের (অকল্যাণ) থেকে রক্ষা করবেন। [সূরা মায়িদা : ৬৭]

সুরাকা পরবর্তীতে কোনো এক সময় আবু জাহ্লকে উদ্দেশ্য করে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিল–

أَبَا حَكَمٍ! وَاللهِ! لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا * لِأَمْرِ جُوَادِيَّ إِذْ تَسِيخُ قَوَائِمُهُ
عَجِبْتَ وَلَمْ تُشَكِّكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا * نَبِيٌّ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهُ
عَلَيْكَ بِكَفِّ النَّاسِ عَنْهُ لِأَنَّنِيْ * أَرَى أَمْرَهُ يَوْمًا سَتَبْدُوْ مَعَالِمُهُ
بِأَمْرٍ يَوَدُّ النَّصْرُ فِيْهِ بِإِلْبِهَا * لَوْ أَنَّ جَمِيْعَ النَّاسِ طُرًّا يُحَارِبُهُ

আবুল হাকাম! [জাহেলী যুগে আবু জাহ্লের উপনাম ছিল 'আবুল হাকাম।'] আল্লাহ্র কসম! তুমি যদি ওই সময় উপস্থিত থাকতে, যখন আমার ঘোড়ার পা জমিনে ধসে গিয়েছিল, তা হলে তুমি বিস্ময়ের সাগরে ডুবে যেতে। তুমি যদি এই বাস্তবতায় কখনও সন্দেহ না করতে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিঃসন্দেহে আল্লাহর সত্য নবী এবং তার প্রমাণও আছে, তা হলে কার এমন দুঃসাহস আছে যে, তার মোকাবিলায় সামনে দাঁড়াবে? তোমার জন্য করণীয়– তুমি মানুষকে তার পথে কাঁটা বিছাতে বাধা দিবে। কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি– এমন এক দিন অবশ্যই আসবে, যেদিন সারা পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় কোনায় মুহাম্মাদের পতাকা উড়বে। তার সাহায্য ও বিজয়কে দুনিয়ার কোনো শক্তিই বাধা দিতে পারবে না। যদি জগতের সমস্ত মানুষও একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তা হলে খোদ 'মদদ'ই সদলবলে তার সাহায্যার্থে চলে আসবে।

হযরত সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম রাযিয়াল্লাহু আনহু ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

[দালাইলুন্নুবুউওয়া লিল বায়হাকী : ৪/৪৮৯, আখবারু মক্কা লিল ফাকিহী : ৪/৮৫, আল-ইসাবা : ৫/৩৬]

(৩০)

কে বাঁচাবে তোমায়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা এক উপত্যকায় ছাউনি ফেললেন। সাহাবায়ে কেরাম এদিক-ওদিক বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। নবীজীও একটি গাছের ডালে নিজের তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে তার ছায়ায় শুয়ে আরাম করছিলেন।

হঠাৎ সেখানে এক মুশরিক এসে উপস্থিত। সে নবীজীর শিয়রের পাশে এসে দাঁড়াল। গাছ থেকে নবীজীর ঝুলন্ত তলোয়ারটি নামিয়ে নবীজীর মাথার উপর তাক করে হাঁক দিল– মুহাম্মাদ! এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? তার হাঁক শুনে নবীজীর চোখ খুলে গেল। নবীজী দেখলেন, এক ব্যক্তি খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাহাবায়ে কেরাম সকলেই এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলেন। নবীজীর সঙ্গে কেউই ছিলেন না। ওই মুশরিকের চেহারা থেকে ক্রোধের আগুন ঠিকরে পড়ছিল। সে প্রতিশোধ নিতে উদ্গ্রীব ছিল। লোকটা কোনো সভ্যভাষী মানুষ ছিল না; সে ছিল জংলী। সভ্যতা-ভদ্রতার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় ছিল না। সে একই কথা বারবার বলছিল–

مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟

(মুহাম্মাদ!) এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?
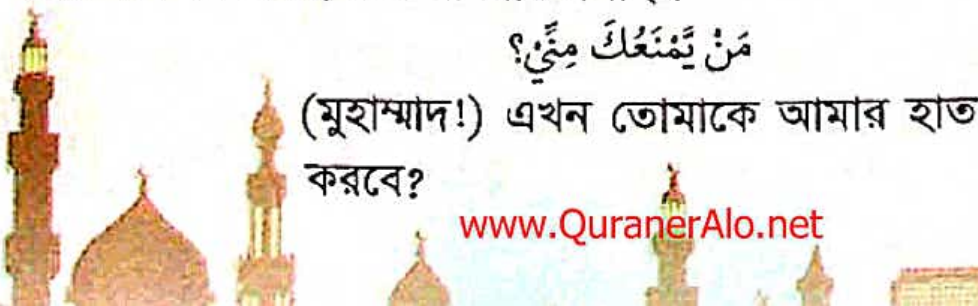
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়া অবস্থায়ই শান্তভাবে জওয়াব দিলেন– আল্লাহ। নবীজীর জবান থেকে এ কথা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সারা গায়ে কাঁপন ধরে গেল। সে এতটাই কাঁপতে লাগল যে, কাঁপতে কাঁপতে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়া থেকে উঠে তলোয়ারটি উঠিয়ে তার দিকে তাক করে বললেন–

مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟

এবার বলো! তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?

ওই মুশরিকের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। সে যখন এসেছিল, তখন তার রক্ত প্রতিশোধের নেশায় টগবগ করছিল। আর এখন তার রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। ঘামে তার সারা গা একাকার হয়ে যাচ্ছে। চক্ষু স্থির হয়ে আছে। সে ভাবতে লাগল, এখন কী করি? লাত-উজ্জাকে ডাকব? কিন্তু লাত-উজ্জা এখন আমা উপকার করবে কীভাবে? আমাকে রক্ষা করবে কীভাবে? সে তার কোনো সাহায্যকারী না পেয়ে, কোনো উপায়ান্তর না দেখে মিনতিভরা কণ্ঠে বলল– এখন আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না। অতএব, আপনিই আমার উপর দয়া করুন। আমাকে ক্ষমা করে দিন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি আছ? সে বলল, না, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি না। তবে আমি আপনাকে এ ওয়াদা দিচ্ছি– আমি আপনার বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করব না। এমনকি আমি এমন কোনো কওমকে সঙ্গও দিব না, যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকটি ছিল তার সম্প্রদায়ের সরদার। সে তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল। কিছুদিন যেতে না যেতেই লোকটি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে সাহাবী হয়ে গেলেন।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯১০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৪৩]

(৩১)
কবরেও ঠাঁই হল না তার!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানার এক খ্রিস্টান প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা; মুনাফেকী। বাহ্যত সে ইসলামের আবরণ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। এমনকি সে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানও পড়ে ফেলেছিল। সে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করত; কখনও কখনও লিখতও। কিছুদিন পরই সে প্রকাশ্য ইসলামটুকুও ত্যাগ করে ফেলল। খ্রিস্টবাদ গ্রহণ করে আহলে কিতাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

তারপরই সে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অশোভন কথাবার্তা বলতে শুরু করল এবং কুরআনে ব্যাপারে মানুষের মাঝে অমূলক সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে বেড়াতে লাগল। সে মানুষের মাঝে প্রচার করে বেড়াত যে, মুহাম্মাদ কেবল তা-ই জানে, যা আমি তাকে লিখে দিয়েছি। এ ছাড়া সে আর কিছুই জানে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করলেন– হে আল্লাহ! আপনি তাকে মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

এর কিছুদিন পরই হঠাৎ একদিন সে মারা গেল। আল্লাহর বিচার বোঝা বড় দায়।

তিনি কাউকে পাকড়াও করতে চাইলে এমন জায়গা থেকে পাকড়াও করেন, যার ব্যাপারে তার ঘুণাক্ষরেরও ধারণা থাকে না।

যা হোক সে মারা গেল। তার সাথি-সঙ্গীরা তাকে যথানিয়মে দাফন করল। সকাল বেলা দেখা গেল, [কবরের] মাটি তাকে বাইরে বের করে দিয়েছে! এ দেখে [তার স্বজাতির] লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, এটি মুহাম্মাদ ও তার সাথি-সঙ্গীদের কাজ! তাদের ধর্ম ত্যাগ করার কারণে তারা এর কবর খুঁড়ে এ কাজ করেছে। এরপর তারা আরও গভীর কবর খনন করে তাকে দাফন করল। পরদিন সকালে তার কবরে গিয়ে দেখা গেল, সেই একই অবস্থায় তার লাশ কবরের বাইরে পড়ে আছে। এবারও তারা বলাবলি করতে লাগল যে, মুহাম্মাদ ও তার সাথি-সঙ্গীরাই এ কাজ করেছে।

এবার তারা আগের তুলনায় আরও গভীর কবর খনন করে তার লাশকে দাফন করল এবং কবরের উপর বেশি করে মাটি দিয়ে স্তুপ করে দিল।

পরদিন সকালে লোকজন এসে সেই একই দৃশ্য দেখতে পেল। আজও তার লাশ কাফন-দাফনহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এবার তারা বুঝতে পারল, এটা কোনো মানুষের কাজ নয়। অতঃপর তারা তার লাশকে ওই অবস্থায়ই ফেলে রেখে চলে গেল। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৭]

এরপর কুকুর-শৃগাল এসে তার লাশ শুঁকত; তার উপর প্রস্রাব করত। হিংস্র প্রাণীরা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেত। পাখিরা তার শরীরের টুকরো নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জায়াগায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিত। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন–

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ .

নিঃসন্দেহে বিদ্রূপকারীদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট। [সূরা হিজ্‌র : ৯৫]

(৩২)
নবীজীকে হত্যার ঘৃণ্য চেষ্টা

মদীনায় ইহুদীদের তিনটি গোত্র বাস করত। বনু কুরাইযা, বনু নাযীর ও বনু কাইনুকা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মাঝে চুক্তি ছিল– নিহত ব্যক্তির দিয়াত [রক্তঋণ] আদায় করাসহ অন্যান্য বিষয়ে একে অপরের সহযোগিতা করবে। অত্যাচারিতদেরকে তাদের হক ও অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ কোনো ধরণের ত্রুটি করবে না।

পরের ঘটনা। বনু আমের গোত্রের দুই ব্যক্তি আমর ইবনে উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ভুলবশত নিহত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীসহ নিহতদের রক্তঋণ পরিশোধকল্পে সহযোগিতার জন্য বনু নাযীরের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কেননা, নিহতদের গোত্র ও মুসলমানদের মাঝে চুক্তি ছিল। তাই
ভুলবশত নিহত হওয়া সত্ত্বেও নবীজী তাদের রক্তঋণ পরিশোধ করে দেওয়া জরুরি মনে করলেন।

নবীজী বনু নাযীরের ইহুদীদের নিকট গিয়ে নিহতদের রক্তঋণ পরিশোধ করার জন্য তাদের কাছে সাহায্য কামনা করলে তারা উত্তরে জানাল– হাঁ, অবশ্যই আমরা আপনাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করব।

কিন্তু গাদ্দারি ও ধোঁকাবাজি ইহুদীদের রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে। তারা নবীজীকে একটি দেয়ালের ছায়ায় বসিয়ে রেখে এই বাহানা দিয়ে চলে গেল যে, আমরা রক্তঋণ পরিশোধকল্পে মালামাল জমা করতে যাচ্ছি।

দূরে গিয়ে তারা সবাই একত্র হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, দেখ! এমন সুযোগ আর আসবে না। এখনই আমাদের উচিত, মুহাম্মাদ যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে আছে, কেউ একজন তার ছাদে চড়ে উপর থেকে একটি ভারী পাথর নিক্ষেপ করে মুহাম্মাদকে শেষ করে দিবে। এভাবে মুহাম্মাদের কিচ্ছা খতম হয়ে যাবে আর আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব।

এই জঘন্যতম অপরাধ বাস্তবায়ন করার জন্য এক হতভাগা ইহুদী তৈরি হয়ে গেল। হতভাগার নাম ছিল আমর ইবনে জাহ্হাশ। সে গিয়ে ওই ঘরের ছাদে চড়ল এবং ভারী একটি পাথর সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। অপরদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। আমর ইবনে জাহ্হাশের পা দ্রুত চলতে শুরু করল। কিন্তু সে জানত না, প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং সেই সর্বশক্তিমান সত্তা গ্রহণ করেছেন, যাঁর দৃষ্টি থেকে একটি পাতার নড়াচড়াও অগোচর নয়; যিনি বুকের ভিতর হৃদয়ের স্পন্দন ও সমুদ্রের গভীরে পড়ে থাকা অণুর ব্যাপারেও পরিপূর্ণ ও সম্যক পরিজ্ঞাত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ .

আর কাফেররা চক্রান্ত করেছে এবং আল্লাহ তাআলাও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুত আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী। [সূরা আলে ইমরান : ৫৪]

একদিকে এই জঘন্যতম অপরাধ বাস্তবায়ন করার জন্য ইহুদীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অপরদিকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে নবীজীকে সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন।

নবীজী তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

ইহুদীরা রক্তঋণ নিয়ে ফিরে আসবে— সাহাবায়ে এই অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন নবীজী সাময়িক কোনো প্রয়োজনে কোথাও গেছেন; কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসবেন। কিন্তু যখন যথেষ্ট সময় পার হওয়ার পরও নবীজী ফিরে এলেন না, তখন সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর খোঁজে বের হলেন। খুঁজতে খুঁজতে মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ। তাকে জিজ্ঞাসা করলে আগন্তুক ব্যক্তি জানাল, আমি নবীজীকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। সাহাবায়ে কেরাম তাজ্জব হলেন! এর কারণ কী! তাঁরাও মদীনায় ফিরে গেলেন। আদবের সঙ্গে নবীজীর ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। নবীজী জানালেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে জানিয়েছেন যে, ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তাই আমি সেখান থেকে চলে এসেছি।

তারপর বনু নযীরের ইহুদীদের সাথে নবীজীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। নবীজী বহুদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রেখেছেন। অবশেষে এক সময় তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছেন।

[দালাইলুন্নুবুউওয়াহ লিল বায়হাকী : ৩/৩৫৪-৩৫৫]
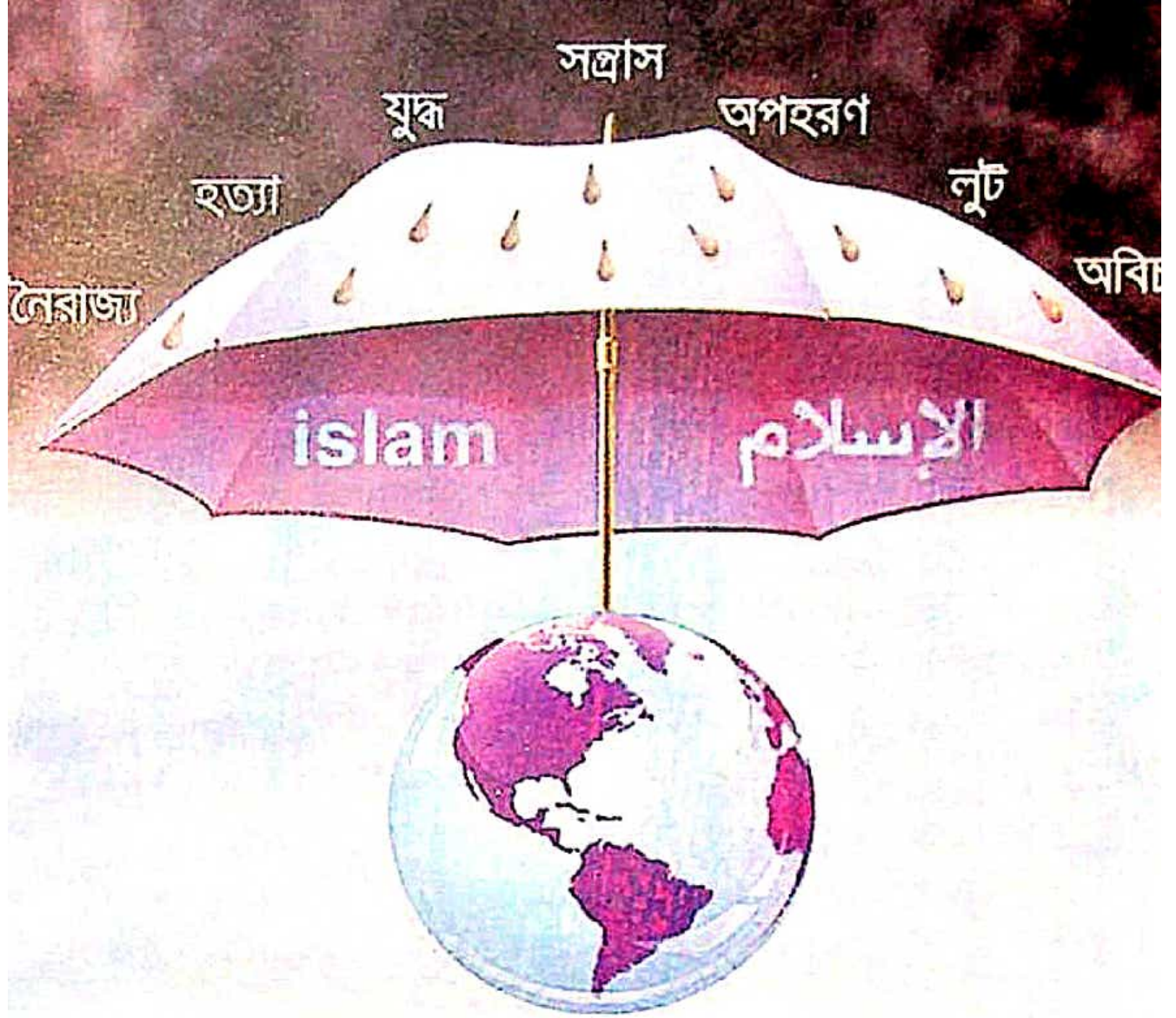
(৩৩)
নবীজীর দোয়া-কবুল

আবু হুরায়রার মায়ের জন্য দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ' [যিনি দোয়া করলে কবুল করা হয়, তাকে 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ' বলে।] ছিলেন। প্রয়োজনপূরণ, বিপদ-আপদ দূরীকরণ, অসুস্থদের সুস্থতাদান, তথ্য উদ্ঘাটন ও বরকত নাযিলসহ যেকোনো বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই দোয়া কবুল করতেন।

নবীজীর দোয়া কবুল হওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে আরও কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব- ইনশাআল্লাহ। নবীজীর কবুল হওয়া দোয়াসমূহের একটি হচ্ছে হযরত আবু হুরায়রা

রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মায়ের জন্য কৃত দোয়া। আবু হুরায়রার মা তখনও জাহেলী ধর্মের উপরই অটল ছিলেন। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু তিনি তা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে দিতেন।

একদিন আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দিলে তিনি নবীজীর শানে অশোভন কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। কথাগুলো ছিল আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সহ্যের বাইরে। তাই তিনি অনেক কাঁদলেন। কান্নারত অবস্থায়ই নবীজীর খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে তার মায়ের মূর্খতা ও অজ্ঞতার অভিযোগ করে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করুন, তিনি যেন দয়া করেন এবং আমার মাকে হেদায়েত দান করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ! اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান করুন।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর দোয়া শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খুব দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটে চললেন। বাড়ি এসে দরজা খোলার জন্য কড়া নাড়লেন। আবু হুরায়রার মা তাঁর পায়ের আওয়াজ শুনেই তাঁকে চিনতে পারলেন। বললেন, আবু হুরায়রা! ওখানেই থাক।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর মা গোসল করছিলেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মা গোসল থেকে অবসর হলেন। কাপড় পরিবর্তন করে দ্রুত এগিয়ে এলেন। দরজা খুলেই বলতে লাগলেন–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
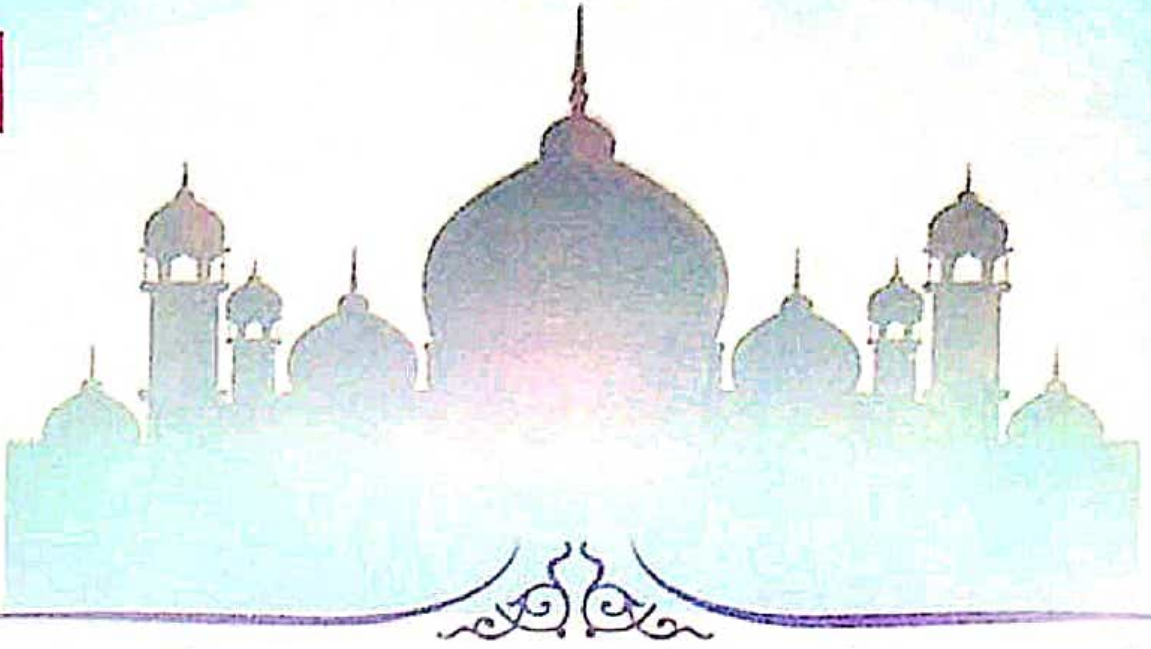
আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু চিক্‌চিক্ করতে লাগল। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন না। দরজা থেকেই উল্টো দিকে ছুটে চললেন। আনন্দের অশ্রুতে পূর্ণ চোখ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন। আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান করেছেন।

এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অত্য আনন্দিত হলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করে আবু হুরায়রার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু সব সময়ই বেশি বেশি দোয়া পাওয়ার আগ্রহী থাকতেন। তাই তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! দোয়া করুন! আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ও আমার মাকে মুসলমানদের প্রিয় বানিয়ে দেন এবং আমাদের অন্তরেও যেন মুসলমানদের প্রতি মহব্বত ঢেলে দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন–

اَللّٰهُمَّ! حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِيْ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

হে আল্লাহ! সমস্ত মুমিন বান্দাদের অন্তরে আপনার এই ছোট্ট বান্দা আবু হুরায়রা ও তার মায়ের মহব্বত ঢেলে দিন এবং তাদের অন্তরও সমস্ত মুমিনের মহব্বতে ভরপুর করে দিন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِيْ وَلَا يَرَانِيْ إِلَّا أَحَبَّنِيْ .

অতঃপর এমন কোনো মুমিন জন্মলাভ করেনি, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমার নাম শুনেছে কিন্তু তার অন্তর আমার মহব্বতে ভরে ওঠেনি।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯১]

(৩৪)
আবু তালহা রাযি. ও তাঁর স্ত্রীর জন্য দোয়া

এক অকল্পনীয় ধৈর্যের কাহিনী

আল্লাহ তাআলা হযরত আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহাকে একটি সুন্দর ফুটফুটে সন্তান দান করলেন। তার নাম রাখলেন আবু উমাইর। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে খুব ভালোবাসতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছেলেটিকে ভালোবাসতেন।

আবু উমাইরের একটি পাখি ছিল। পাখির নাম ছিল নুগাইর। আবু উমাইর পাখিটি নিয়ে খেলা করত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তার সঙ্গে একটু আনন্দ করতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন–

يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

আবু উমাইর! তোমার পাখির কী খবর?

হঠাৎ একদিন ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছেলের অসুখ দিন দিন বেড়েই চলল। এক পর্যায়ে অসুস্থতা সীমা ছাড়িয়ে গেল। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর
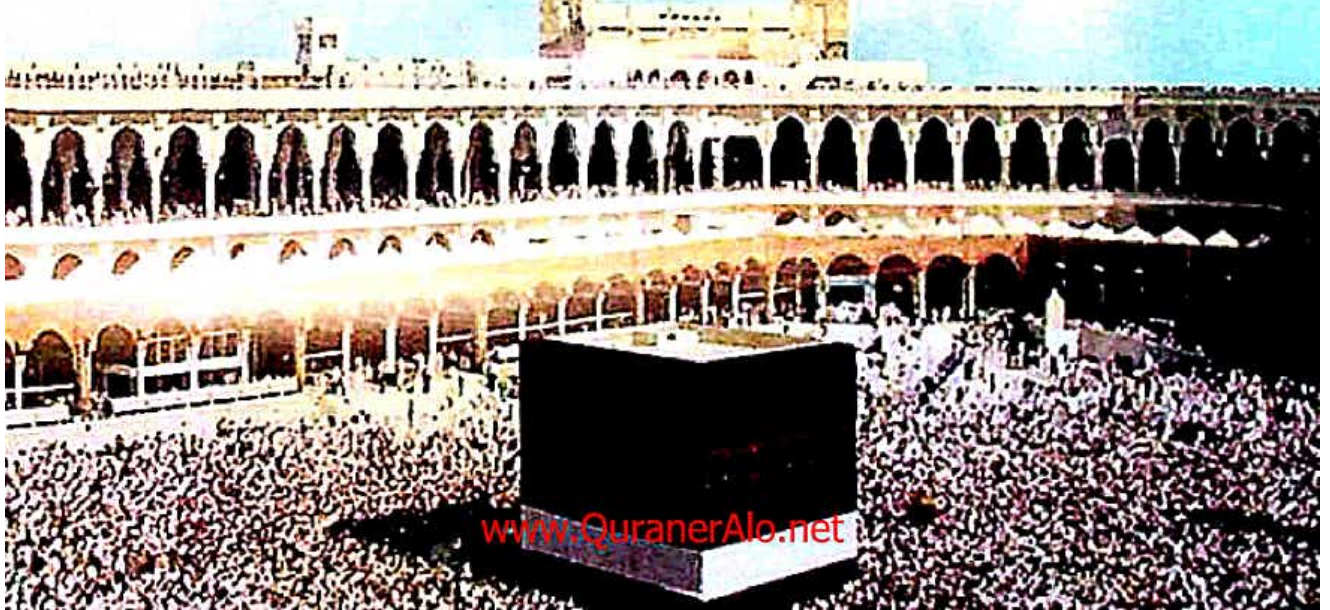
দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখান থেকে ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অসুস্থতা প্রকট আকার ধারণ করল এবং শেষ পর্যন্ত আবু উমাইর মারা গেল।

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা ছেলের কাছেই ছিলেন। ঘরের কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিলেন। কান্না থামিয়ে সবাইকে চুপ করালেন এবং বলে দিলেন– আবু তালহাকে তোমরা কেউ কিছু বলো না; আমি নিজেই তাঁকে বলব। অতঃপর তিনি ছেলের লাশকে ঘরের এক কোণে রেখে তার উপর কাপড় জড়িয়ে দিলেন। তারপর স্বামীর জন্য খাবার প্রস্তুত করতে লেগে গেলেন।

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন? উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, শান্তই আছে। আমার মতে সে এখন আরামেই আছে। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে চাইলেন। উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে এখন আরাম করছে। তাকে আরাম করতে দিন। তার আরামে ব্যাঘাত ঘটাবেন না।

তারপর দস্তরখান বিছিয়ে খাবার পরিবেশন করলেন। তারা উভয়েই খাবার খেলেন। অতঃপর সেই রাতে স্বামী-স্ত্রীর হকও আদায় করলেন। উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন কথা বলতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন, আবু তালহা! [আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি] যদি কেউ কাউকে কোনো কিছু ধার দেয়; অতঃপর কিছুদিন পর সে তার আমানত ফিরে চায়, তা হলে সেই আমানত ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করা কি ওই ধারগ্রহীতার জন্য শোভন হয়? আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না না; কখনোই না।

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনি কি আমাদের প্রতিবেশীদের উপর আশ্চর্য হন না? আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন, কী হয়েছে? তারা কী করেছে?

উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তারা কারও কাছ থেকে একটি বস্তু ধার এনেছিল। বস্তুটি অনেক দিন পর্যন্ত তাদের কাছে ছিল। এক সময় তারা বস্তুটিকে নিজের বলেই মনে করতে লাগল। ফলে যখন তার প্রকৃত মালিক এসে বস্তুটি ফিরিয়ে নিতে চাইল, তখন তারা কান্নাকাটি করতে শুরু করল। চিৎকার করতে লাগল। তারা পীড়াপীড়ি করে বলতে লাগল, আমরা তা ফিরিয়ে দিব না। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারা তো অনেক মন্দ কাজ করেছে!

এবার উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা স্বামীকে বললেন, এবার শুনুন! ওই যে আপনার ছেলে। তাকে আমরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম। এখন আল্লাহ তাআলা তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। আপনি এতে ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রতিদানের আশা রাখুন।

স্ত্রীর কথা শুনে আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু একেবারে থ বনে গেলেন। তথাপিও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, আল্লাহর কসম! আজ রাতে ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে তুমি আমার উপর বিজয়ী হতে পারবে না।

অতঃপর তিনি অত্যন্ত হিম্মতের সঙ্গে দাঁড়ালেন। ছেলের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই বরকতের দোয়া করলেন।

নবীজীর দোয়ার বরকতে উম্মে সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে একটি সন্তান জন্মলাভ করল। নবীজী তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ'র নয় জন সন্তান হয়েছে। তাদের সকলেই পবিত্র কুরআনের হাফেজ ছিল।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩০১, ৬২০৩, মুসনাদে আহমাদ : ৩/১০৬ ও ১৮১]

(৩৫)

ভয়ংকর পরিণতি!

কতই না প্রিয় ছিল ওই যামানা, যখন চতুর্দিকেই একত্ববাদের বাণী সমুন্নত ছিল। কতই না প্রিয় ছিল সেই সমাজের দৃশ্য, যার প্রতিটি অলিতে-গলিতে হকের বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক-একটি মজলিসে তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা স্বেচ্ছায় এসে তাঁর আনুগত্য ও কর্তৃত্ব মেনে নিত; নবীজীর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করত।

আবার এমনও কিছু লোক ছিল, যাদের অন্তর ছিল হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতায় পরিপূর্ণ। যারা ইসলামকে সহ্য করতে পারেনি। যদিও কালে তারা পরাজিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে নবীজীর সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ইসলামকে মেনে নিতে পারেনি। এমনই একজন হচ্ছে আমের ইবনে তোফায়েল। সে ছিল আরবের প্রভাবশালী এক সরদার। সে তার গোত্রে অত্যন্ত প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিল। চতুর্দিকে ইসলামের জয়জয়াকার দেখে এক সময় তার নিজের গোত্রের লোকেরাই তাকে বলল, আমের! সমস্ত মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছে। সমস্ত বাদশাহরা বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে। তবে তুমি আর বাদ থাকবে কেন? তুমিও ইসলাম গ্রহণ করে নাও।

আমের ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক, অহংকারী ও আত্মম্ভরি। সে বলল, আল্লাহর

কসম! আমি কসম করে রেখেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুকেও আমার কাছে আসতে দিব না, যতক্ষণ না সারা আরব আমাকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নেয় এবং সকলে আমার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, আর তোমরা কি না বলছ ওই কুরাইশীর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে আমি তার গোলাম হয়ে যেতে!

সর্বশেষ যখন সে দেখল ইসলাম অন্যান্য সমস্ত বাতিল ধর্মমত ও মতবাদকে পদদলিত করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে; ব্যাপকহারে মানুষ নবীজীর আনুগত্য গ্রহণ করে নিচ্ছে; যে-ই একবার মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, সে-ই নবীজীর একটিমাত্র ইশারায় জীবন বিসর্জন দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে, তখন সে-ও একদিন উটের উপর সওয়ার হয়ে কয়েকজন সঙ্গী-সাথি নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। এক সময় সে মসজিদে নববীতে গিয়ে হাজির হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে অবস্থান করছিলেন। আমের নবীজীর সামনে গিয়ে বলতে লাগল, মুহাম্মাদ! আমি তোমার সঙ্গে একাকী কিছু কথা বলতে চাই।

নবীজীর সাধারণ নিয়ম ছিল– যথাসম্ভব তিনি এ জাতীয় লোকদের থেকে দূরে থাকতেন। তাই তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাসী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার কথা শুনব না। সে আবারও সেই একই কথা বলল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আগের মতোই জওয়াব দিলেন। কিন্তু সে বারবার নবীজীর সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল– মুহাম্মাদ! এসো! আমার কথা শোন! আমি একাকী তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। অবশেষে নবীজী তার পীড়াপীড়ির কারণে উঠে দাঁড়ালেন

এবং তার সঙ্গে চলতে শুরু করলেন।

আমের ইারবাদ নামের তার এক সঙ্গীকে কাছে টেনে এনে চুপিসারে বলল, আমি তাকে কথায় কথায় ব্যস্ত রাখব। যখন সে পুরোপুরি আমার দিকে মনোযোগী হয়ে যাবে, তখন তুমি সুযোগ বুঝে তলোয়ারের এক কোপে তার কিচ্ছা খতম করে দিবে। ইরবাদ কথা অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে রইল। ওদিকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমেরের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে ইরবাদ যখনই খাপ থেকে তলোয়ার বের করার জন্য হাত বাড়াল, তখনই তার হাত সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেল। তারপর তার সারা দেহই আড়ষ্ট হয়ে গেল।

আমের কু-মতলব নিয়ে নবীজীকে বিভিন্ন কথায় ব্যস্ত করে রাখল। সে অস্থির হয়ে বারবার ইরবাদের দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ইরবাদ পাথরের মূর্তির ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নবীজী পিছনে তাকিয়ে ইরবাদকে দেখতে পেয়ে আমেরের সমস্ত ষড়যন্ত্র বুঝে ফেললেন। তথাপিও নবীজী আমেরের কল্যাণই কামনা করলেন। তাঁকে বললেন, আমের! ইসলাম গ্রহণ করে নাও!

সে বলল, মুহাম্মাদ! আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তা হলে আমি কী পাব? নবীজী বললেন–

لَكَ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ .

তোমার জন্য তা-ই থাকবে, যা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য আছে। আর তোমার যিম্মায়ও তা-ই বর্তাবে, যা অন্যান্য মুসলমানদের যিম্মায় বর্তায়।

আমের পুনরায় বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিই, তা হলে কি তুমি তোমার পর আমাকে বাদশাহ বানিয়ে দিবে? নবীজী জওয়াব দিলেন, সাম্রাজ্য তুমিও পাবে না, তোমার সম্প্রদায়ও পাবে না। সে বলল, আচ্ছা! আমি এ শর্তে মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি যে, গ্রামাঞ্চলে আমার রাজত্ব থাকবে আর শহরাঞ্চলে তোমার। নবীজী বললেন, এ-ও হতে পারে না।

এ কথা শুনে আমের ক্রোধে ফেটে পড়ল। সে হুমকি দিল— আল্লাহর কসম! হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাদের শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আমার যুদ্ধবাজ সৈন্যদের পাঠিয়ে দিব। তোমাদের অঞ্চলের প্রতিটি খেজুর গাছের সাথে আমাদের ঘোড়া বাঁধব। গাতফান গোত্রের উঁচু উঁচু চুঁটিওয়ালা হাজারো উট তোমাদের মোকাবিলায় দাঁড় করাব! এ বলে আমের রাগে-ক্রোধে মুখে ফেনা তুলতে তুলতে, গর্জন করতে করতে, হুমকি-ধমকি দিতে দিতে সেখান থেকে চলে গেল।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করলেন—

হে আল্লাহ! আমেরের মোকাবিলায় তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও এবং তার কওমকে হেদায়েত দাও।

আমের তার দলবল নিয়ে মদীনা থেকে অনেক দূর পর্যন্ত অতিক্রম করে ফেলল। অব্যাহতভাবে পথ চলতে চলতে হঠাৎ সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে তারই সম্প্রদায়ের এক মহিলার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তার নাম ছিল সালুলিয়া। সে তাবু খাটিয়ে খোলা প্রান্তরে বসে ছিল। আমের ঘোড়া থেকে নেমে ওই মহিলার তাবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ তার ঘাড়ে একটি ফোঁড়া দেখা দিল এবং তার গলা ফুলে গেল। তার গলা এতটাই ফুলে গেল, যেমনটা ফুলে যায় মহামারীতে আক্রান্ত উটের গলায় পোকা ধরলে; যে মহামারী উটের জান বের করে তবেই ক্ষান্ত হয়। এতে আমের অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে চরম অস্থির হয়ে ওঠল। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বর্শা হাতে ঘোড়াকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাতে লাগল। যন্ত্রণার আধিক্যে সে বিশ্রী আওয়াজে গোঙাচ্ছিল।
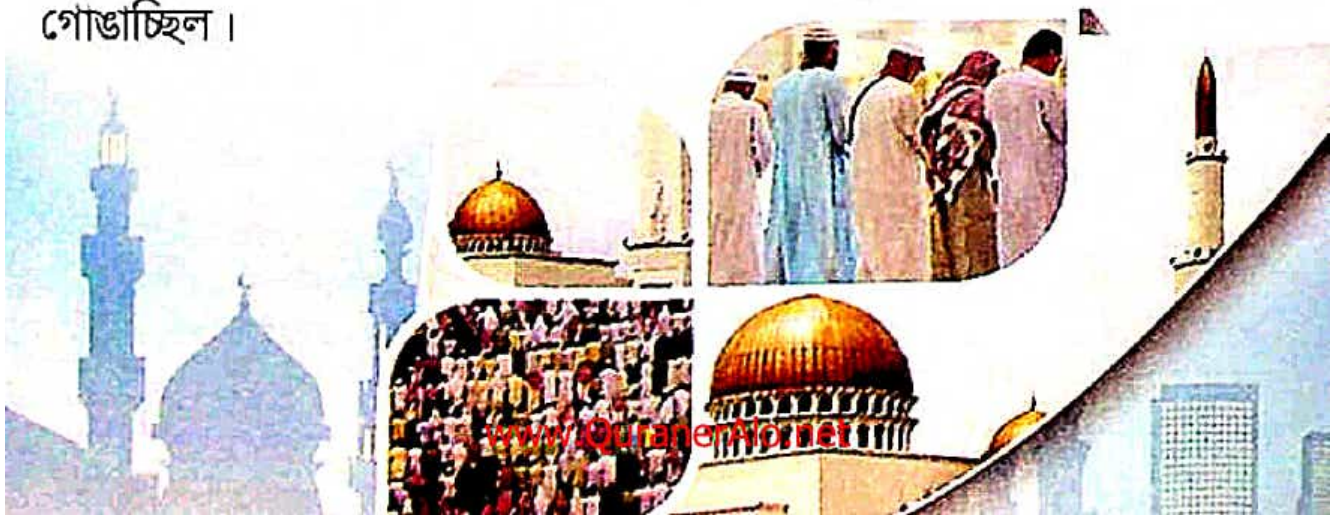
নিজের ঘাড়ে হাত ফেরাচ্ছিল আর আক্ষেপ করে বলছিল– হায়! একি হল আমার? উটের ফোঁড়া আমার ঘাড়ে! আর এই সালুলিয়ার ঘরে এসে মৃত্যু আমাকে চেপে ধরেছে! সে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইতস্তত ঘুরপাক খাচ্ছিল। এক সময় সে বেহুঁশ হয়ে ঘোড়া থেকে নীচে পড়ে গেল এবং তখনই মরে গেল। তার সঙ্গীরা তাকে তেমনই অসহায় ও সাথি-সঙ্গীহীন অবস্থায় ফেলে রেখে আপন গন্তব্যের পথ ধরল। তারা নিজেদের গোত্রে পৌঁছলে বহু লোক এসে তাদের আশপাশে জড়ো হল এবং ইরবাদকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল– তোমাদের সফরের অবস্থা বর্ণনা কর। সে বলল, কী আর বলব? আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ আমাদেরকে কোনো এক বস্তুর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ যদি তখন আমার সামনে থাকত, তা হলে আমি তার দেহকে তীরের আঘাতে আঘাতে চালনী বানিয়ে ফেলতাম।

এ অসভ্য ও অশোভন কথাবার্তা বলার দু' এক দিন পরই সে তার উট বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে আল্লাহ তাআলা তার ও তার উটের উপর আকাশ থেকে এমন বজ্র নিক্ষেপ করলেন, যা উভয়কেই জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। আল্লাহ তাআলা আমের ও ইরবাদের এই দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন–

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ * لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ * هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ * وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ .

তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে

আত্মগোপন করুক কিংবা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবই তাঁর নিকট সমান। তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাঁর অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা তাঁর হেফাজত করে। আল্লাহ্ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোনো জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উত্থিত করেন ঘন মেঘমাল। তার প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সমস্ত ফেরেশতা সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিমান।

[সূরা রা'দ : ১০-১৩, সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৪০৯১, তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম : ৭/২২৩০, ২২৩১, হাদীস নং ১২১৯৩]

(৩৬)
নবীপ্রেম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বহু মু'জিযা দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তাঁর জন্য সাহাবায়ে কেরামের এমন এক জামাতকে নির্বাচন করেছেন, যাঁরা অন্যান্য সকল উম্মত থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ও সুমহান চরিত্রের অধিকারী। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ভালোবাসতেন নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি; নিজেদের জানমাল ও সন্তান-সন্ততি থেকেও বেশি। তাঁরা নবীজীর একটিমাত্র ইশারায় নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিতেন বিনা দ্বিধায়।

গায্ওয়ায়ে উহুদের জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের সামনে। মুশরিকরা যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে ফেলার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, সাহাবায়ে কেরাম তখন দুশমনদের তীরবৃষ্টির সামনে নিজেদের সীনা টান করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজীর হেফাজতের জন্য তারা দুশমনদের তীর-তলোয়ারের আঘাত সানন্দে নিজেদের শরীরে গ্রহণ করে নিয়েছেন। জীবন দিয়ে নবীজীকে হেফাজত করেছেন। নবীজীর গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেননি।

নবীজীর আশেক তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখুন। তিনি নবীজীর সামনে দাঁড়িয়ে দুশমনদের তীরবৃষ্টি নিজের বক্ষে ধারণ করছিলেন। তীর-তলোয়ারের উপর্যুপরি আঘাতে জখম হচ্ছিলেন

আর বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তালহার শিরায় এক বিন্দু রক্ত বাকি থাকতে আপনার পর্যন্ত একটি তীরও আসতে দিব না। কোনো তীর আপনার পর্যন্ত পৌঁছতে হলে তালহার কলিজা ভেদ করেই তবে পৌঁছতে পারবে!

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবীজীর কাছে পৌঁছে দেখলাম, এক ব্যক্তি জীবন বাজি রেখে নবীজীকে রক্ষা করে চলেছেন; দুশমনদের বিরুদ্ধে পাগলের ন্যায় লড়ে যাচ্ছেন। আমি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখলাম, তিনি তালহা [রাযিয়াল্লাহু আনহু]। তিনি একের পর এক তীর-তলোয়ারের আঘাতে জখম হচ্ছিলেন। তালহার শরীরে যখন জখম ধারণের আর কোনো জায়গা ছিল না, তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

তিনি ঢলে পড়তেই আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনভাবে ছুটে এলেন, যেন কোনো পাখি উড়ে চলে এল। তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে জমিনে পড়ে আছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, তোমাদের ভাইকে সাহায্য কর। সে নিজের জন্য জান্নাতকে আবশ্যক করে নিয়েছে।

[আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন] আমরা তালহার কাছে গিয়ে দেখলাম, তাঁর শরীরের ৩৯ জায়গায় তীর-তলোয়ার ও বর্ষার আঘাতের ক্ষত রয়েছে; যা থেকে রক্ত ঝড়ছিল।

[মুসনাদে আবী দাউদ আত-তয়ালীসী : ১/১০, হাদীস নং ৬, সহীহ ইবনে হিব্বান : ১৫/৪৩৭, ৪৩৮, হাদীস নং ৬৯৮০]

যুদ্ধ শেষ হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক সাহাবীকে স্মরণ করলেন। তিনি রাতে নবীজীর সাথে নামায পড়তেন। দিনে নবীজীর সাথে রোযা রাখতেন। ওই সাহাবী দ্বীনের জন্য তার সমস্ত কিছুই উজাড়
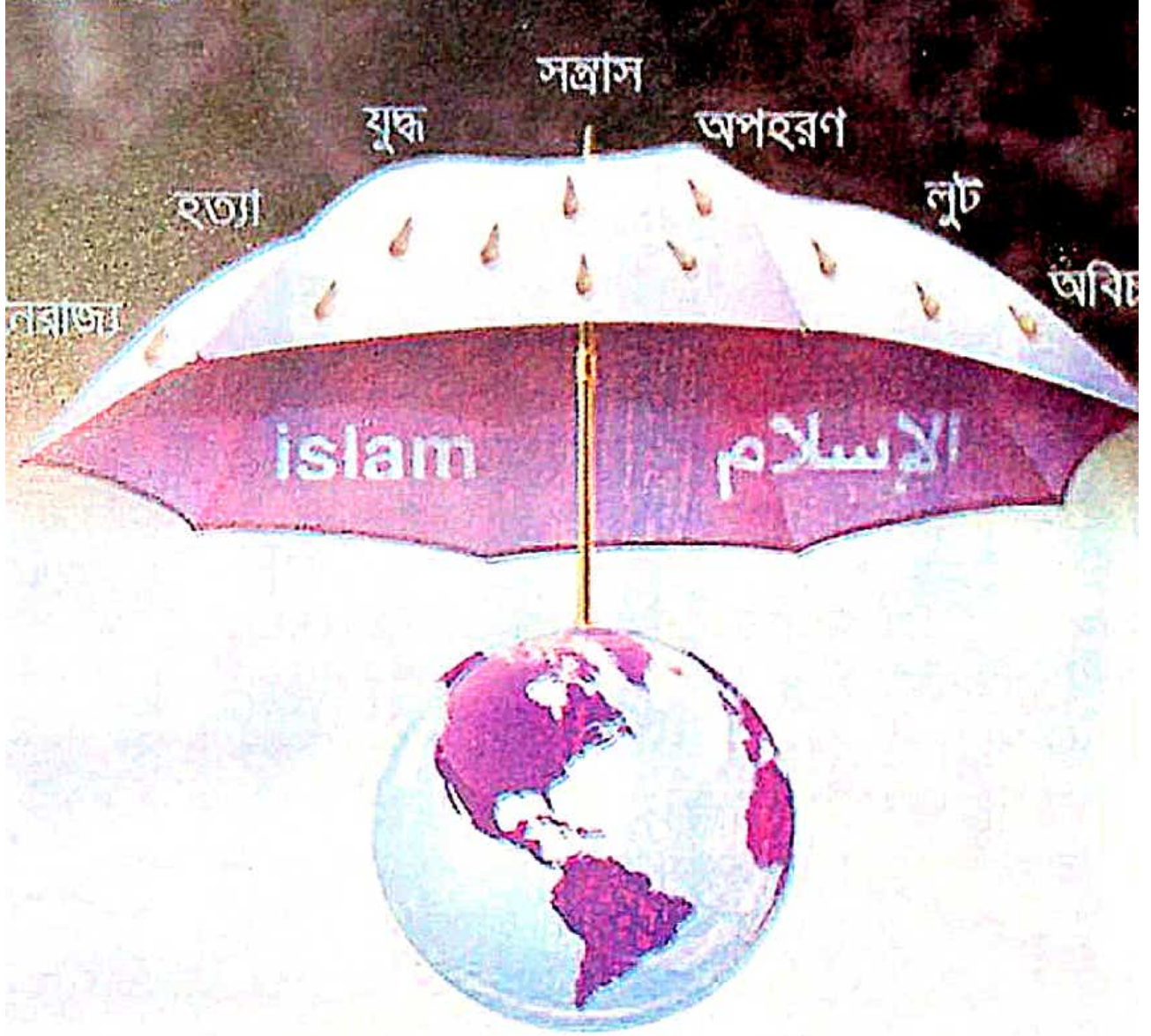
করে দিয়েছিলেন। এমনকি নিজের জীবনটাও আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করে দিয়েছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইবনে রবী আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নাম নিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কেউ একজন গিয়ে দেখে এসো সা'দ ইবনে রবী জীবিত আছে না শহীদদের কাতারে শামিল হয়ে গেছে।

এক আনসারী সাহাবী সা'দ ইবনে রবী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খোঁজ করতে করতে নিহতদের সারিতে পৌঁছে দেখলেন তিনি জখমে জখমে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে আছেন; রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তাঁর দেহের উপর ধুলার স্তর পড়ে গেছে। তিনি জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছেন।

অনুসন্ধানকারী সাহাবী বললেন, সা'দ! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তোমার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু দৃষ্টি তুলে তাকালেন।

বললেন, আমার জীবন এখন নিভু নিভু এক প্রদীপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার শেষ নিঃশ্বাস বেড়িয়ে যাবে। তুমি নবীজীর খেদমতে পৌঁছে আমার সালাম নিবেদন করো এবং আমার এ আর্জিগুলোও পৌঁছে দিয়ো যে– 'আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দান করুন, যা সে সকল দান-প্রতিদান থেকে উত্তম, যা অন্যান্য নবী-রাসূলগণকে তাঁদের উম্মতদের পক্ষ থেকে দান করেছেন।' আর আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আমার পক্ষ থেকে বলো এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ো– 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের একজনও জীবিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যদি একটি তীরও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা হলে কেয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ তাআলার সামনে মুখ দেখানোর যোগ্য থাকবে না।'

আর হাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ো যে– হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব! সা'দের কাছে জান্নাতের সুরভিত বাতাসের ঝাপটা আসছে।... এ কথা বলেই তিনি পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

[দালাইলুন্নবুউওয়াহ লিল বায়হাকী : ৩/২৮৫, মুস্তাদ্রাকে হাকেম : ৩/২০১]

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.
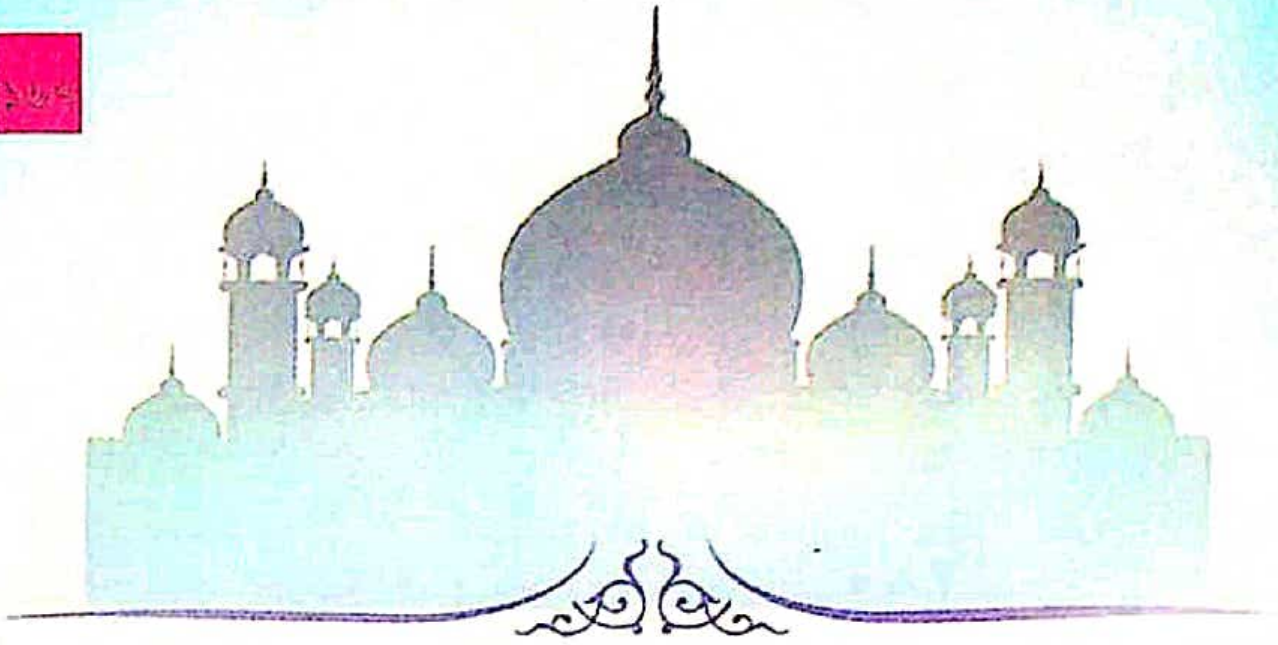
(৩৭)

নজিরবিহীন ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের যে অবিশ্বাস্য ও নজিরবিহীন মহব্বত ছিল, মক্কার কাফের-মুশরিকরাও তা স্বীকার করত।

মক্কা বিজয়ের দুই বছর পূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। ওই সফরে নবীজী হারাম শরীফের কাছাকাছি পৌছলে মক্কার কুরাইশরা লোক পাঠিয়ে নবীজীকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌছতে বাধা দিল। মক্কা থেকে আগত দলটিতে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীও ছিল। উরওয়া যখন নবীজীর সঙ্গে কথা বলছিল, সাহাবায়ে কেরাম তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশপাশে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। নবীজীর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের নজিরবিহীন ভালোবাসা ও আনুগত্যের কিছুটা ঝলক সে দেখতে পেল। নবীজীর মুখের থুথু পড়লে তৎক্ষণাৎ সাহাবায়ে কেরাম তা নিয়ে নিজেদের চেহারা ও শরীরে মাখতেন। নবীজী কোনো হুকুম দিলে হুকুম শেষ হওয়ার আগেই তা বাস্তবায়নের জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতেন। নবীজী ওযু করলে তাঁর শরীর-ছোঁয়া পানি সংগ্রহের জন্য তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নবীজী কথা বললে তাঁরা নিজেদের মুখে একদম তালা

লাগিয়ে দিতেন। সকলে এমন স্থির হয়ে যেতেন, যেন তাঁদের মাথায় কোনো পাখি বসে আছে, সামান্য নড়াচড়া করলেই সেটি উড়ে যাবে!

উরওয়া এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল! ফিরে গিয়ে সে তার সাথি-সঙ্গীদের বলতে লাগল– আল্লাহর কসম! আমি বহু বড় বড় রাজা-বাদশাহ দেখেছি; আমি কিসরাকে দেখেছি; কায়সারকে দেখেছি; দেখেছি নাজাশীকেও... কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনো বাদশাহকে দেখেনি, যার সাথি-সঙ্গীরা তাকে এতটা ভালোবাসে ও সম্মান করে, যতটা ভালোবাসে ও সম্মান করে মুহাম্মাদকে তাঁর সাথি-সঙ্গীরা।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩১, ২৭৩২, আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী : ৯/২১৯]

(৩৮)

নবীজীর প্রতি ভালোবাসা

সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে নিজেদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এককথায় পৃথিবীর সবকিছু থেকে বেশি ভালোবাসতেন। কখনও কখনও তাঁরা তা মুখে প্রকাশও করতেন।

একদিন হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমার কাছে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থেকেও অধিক প্রিয়। রবং ওই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ দান করেছেন, আপনি আমার কাছে আমার জানের চেয়েও বেশি প্রিয়।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৩২, মাউসূআতুদ্ দিফা আন রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম : ২/২১৩]

এক সাহাবী একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কেয়ামত কবে হবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উল্টো জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সাহাবী উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার জন্য তেমন বেশি কিছু করিনি– না বেশি নফল নামায পড়েছি আর না ততবেশি রোযা রেখেছি, না অধিক পরিমাণে সদকা করেছি, তবে আমি এতটুকু করেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ .

তুমি যাকে ভালোবাস কেয়ামতের দিন তুমি তার সাথেই থাকবে।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৭১]

সাহাবায়ে কেরামও অন্য কোনো কথায় এতবেশি খুশি হতেন না, যতটা খুশি হতেন নবীজীর এ কথায় যে– . أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ [তুমি যাকে ভালোবাস কেয়ামতের দিন তুমি তার সাথেই থাকবে।] এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুনিয়াতে তুমি যাকে ভালোবাস এবং যার জীবন-পদ্ধতি ও আদর্শ মোতাবেক তোমার নিজের জীবনকে পরিচালিত কর, জীবনের যাবতীয় বিষয়াদিকে যার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে পরিচালিত কর; যার খুশিকে নিজের খুশির উপর, যার পেরেশানীকে নিজের পেরেশানীর উপর, যার আগ্রহকে নিজের আকাঙ্ক্ষার উপর, সর্বোপরি যার সুন্নাতকে নিজের বংশীয় রুসুম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের উপর প্রাধান্য দাও, কেয়ামতের দিন সে-ই হবে তোমার বন্ধু, সে-ই তোমার মিত্র।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে চলতেন, তখন প্রখর রোদ নিজেদের গায়ে মেখে নবীজীকে ছায়া দিতেন। সফরের সময় নিজেরা রৌদ্রে থেকে ছায়াবিশিষ্ট গাছটিকে নবীজীর বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতেন।
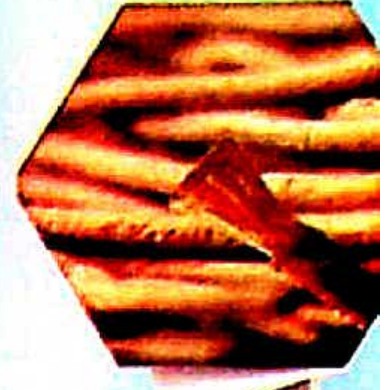
(৩৯)

কেমন ছিল নবীজীর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালোবাসা!

সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, ভালোবাসার ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। ইতিহাসের পাতায় তা চির অম্লান। তবে নবীজীর প্রতি তাঁদের সীমাহীন ভালোবাসা ও মহব্বত থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তাঁরা কোনোদিন তাঁর শানে বাড়াবাড়ি করেননি। কখনও তাঁকে তাঁর স্তর থেকে উপরে ওঠাননি কিংবা তাঁকে মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য-মুক্ত [নূরের তৈরি সত্তা] বলেও মনে করেননি। কেননা, আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি মাটির তৈরি মানুষ। তবে এটা ঠিক যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই এক অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় বান্দা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমগ্র বনী আদমের সরদার ও কঠিন কেয়ামতদিবসের সুপারিশকারী বানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্মান কেবল তাঁরই; এ ক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। মনে রাখতে হবে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তেমনই, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ.

[হে মুহাম্মাদ!] বল, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের মাবুদই একমাত্র মাবুদ। অতএব, তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। [সূরা হা মীম সেজদা : ৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে [মাটির তৈরি] মানুষ বললে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি আসে না। তিনি তাঁর রবের বাণী পৌঁছিয়েছেন; দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাহায্য করেছেন। জগতের প্রতিটি কোণায় কোণায় তাঁর দ্বীন ছড়িয়ে দিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [মাটির তৈরি] মানুষ হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং তাঁর মুখের বাণী দ্বারাই সুপ্রমাণিত। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [মাটির তৈরি] মানুষ– এই দোষ দেখিয়েই তো মক্কার মুশরিকরা তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করেছিল। তারা আরও বলেছিল, যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا .

আর মানুষের নিকট হেদায়েত এসে পৌঁছার পর তাদেরকে এই একটি বিষয়ই কেবল ঈমান গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করেছে যে, তারা বলে, আল্লাহ কি একজন 'মানুষ'কে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

[সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন–

তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে খাদ্য আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোনো ফেরেশ্‌তা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে (মানুষদেরকে) সতর্ককারী হয়ে থাকত। অথবা তিনি ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি (ফল) আহার করতেন? জালিমরা (মুমিনদেরকে) বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। দেখুন, তারা আপনার জন্য কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তারা পথ পেতে পারে না। [সূরা ফুরকান : ৭-৯]

(৪০)
উম্মতের উপর নবীজীর হক কী?

উম্মতের উপর কি নবীজীর এই-ই হক যে, তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত গান-কবিতা আর গীত গাওয়া হবে? তাঁর এত বেশি স্তুতি-বন্দনা করবে যে, তাঁকে একেবারে আল্লাহ তাআলার সমপর্যায়ে পৌঁছে দিবে? এই-ই কি উম্মতের উপর নবীজীর হক? কক্ষনো নয়; এটা কখনোই হতে পারে না। কারণ, এ জাতীয় কার্যকলাপ থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিষেধ করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ .

তোমরা আমাকে আমার শান ও মরতবা থেকে বাড়িয়ো না, যেমন খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামকে তাঁর মরতবা থেকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ তাআলার একজন বান্দা। অতএব, তোমরাও বল– 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫]

আমাদের উপর কি নবীজীর এই-ই হক যে, আমরা তাঁর জন্মের খুশিতে কিংবা মে'রাজের আনন্দে নির্ধারিত দিবসে বড় বড় শোভাযাত্রা বের করব? যেখানে ঢোল-তবলা ও বাজনা বাজানো হবে; নৃত্য করা হবে এবং ফিল্মী সুরে কাওয়ালি গাওয়া হবে? এই-ই কি আমাদের উপর তাঁর হক? বছরে একদিন মিলাদ মাহফিল করেই কি নবীজীর মহব্বতের হক আদায় হয়ে

যায়? আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে! নবীজীর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় এমন এক দিনে, যেদিন নবীজীর জন্ম নয় বরং এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ওইদিন নবীজী ইন্তেকাল করেছেন।

পৃথিবীর কেউ কি এ কথা প্রমাণ করতে পারবে যে, নবীজী নিজের জন্মদিন কিংবা মে'রাজের খুশিতে তাঁর সুদীর্ঘ ৬৩ বছর জীবনে কোনো দিন কোনো মিলাহ মাফফিল করেছেন? তাঁর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খেলাফতের ২ বছরে, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের ১১ বছরে, হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের ১২ বছরে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের ৫ বছরে, হযরত হাসান ও হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাঁদের পুরো জীবনে, হযরত মোআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের ২০ বছরে এবং সর্বশেষ সাহাবী আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা লাইসী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকাল পর্যন্ত ১১০ বছরের এই সুদীর্ঘ সময়ে কেউ কোনো দিন কোনো মিলাদ মাহফিল করেছেন?

আসলে মিলাদ মাহফিল কায়েম করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক হবেই বা কীভাবে? তা থেকে তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিষেধ করেছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ .

যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে, যা আমাদের সুন্নাত মোতাবেক হবে না, তা-ই প্রত্যাখ্যাত। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮]

উম্মতের উপর কি নবীজীর হক এই যে, তারা বিপদে পড়লে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছেড়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে?! অথবা তাঁর কবরকে তওয়াফ করবে? কিংবা আল্লাহর নাম ছেড়ে তাঁর নামে কসম করবে? কক্ষনোও নয়। মনে রাখবেন, এ সবই শিরক। এগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার পরিপন্থী।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হকসমূহ হচ্ছে এই–

প্রথম হক

এ কথা বিশ্বাস করা যে, তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। তাঁকে নিজের জানমাল, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা। অন্তরে সব সময় তাঁর মান-মর্যাদা ও আদব-ইহতিরামকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সক্রিয় রাখা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

সুতরাং, যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের জন্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। [সূরা আ'রাফ : ১৫৭]

দ্বিতীয় হক

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত সংবাদ প্রদান করেছেন সেগুলোকে সত্যায়ন করা। কেননা, নবীজী নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছুই বলেন না। বরং যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম হয়, তখনই কেবল বলেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .

আর তিনি (নিজের) ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছু বলেন না। তা তো ওহী-ই, যা (তার নিকট) প্রেরণ করা হয়। [সূরা আন-নাজ্‌ম : ৩-৪]

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের যত আলামত বর্ণনা করেছেন এবং শেষ যামানায় সংঘটিতব্য বিষয়ে যে সকল ভবিষ্যৎবাণী করেছেন; এ ছাড়া আরও যত অবগতি, হেদায়েত ও সংবাদ প্রদান করেছেন, সে সবকিছুই বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া। টু শব্দটিও না করা। সে সকল বিষয়ে নিজেদের অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ বিবেকের ঘোড়া না দৌড়ানো, তা হলেই আমরা হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা পাব। কারণ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ও সুবিধিত যে, একদিন প্রমাণিত হবেই যে, আমার বিবেক-বুদ্ধি মিথ্যা আর কুরআনে কারীম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীই সত্য।

তৃতীয় হক

তৃতীয় হক হচ্ছে নবীজী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করা। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর উপর রহমত ও দুরূদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ কর এবং খুব বেশি বেশি সালাম প্রেরণ কর। [সূরা আহ্যাব : ৫৬]

নবীজীর উপর দুরূদ পাঠের বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত

১. যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা করা হয়, তখন আবশ্যকীয়রূপে তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করতে হয়। কেননা, নবীজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ .
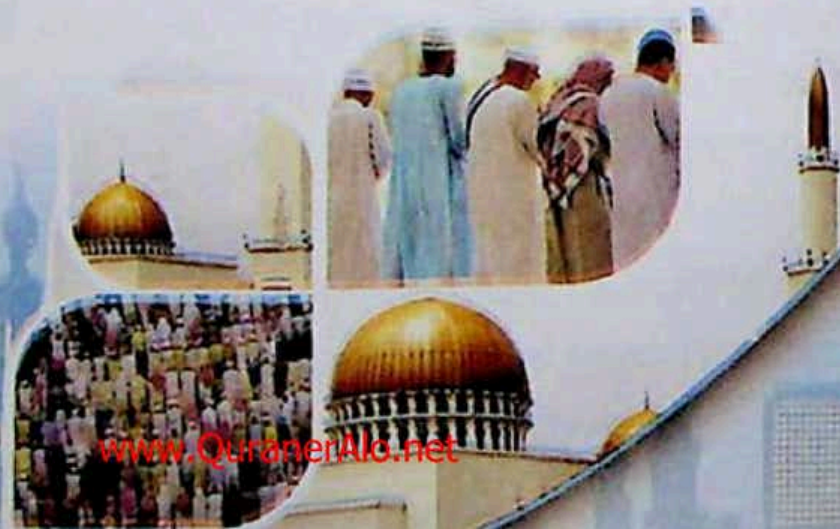
ওই ব্যক্তির নাক ধূলি ধূসরিত হোক, যার সামনে আমার আলোচনা করা হল, অথচ সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করল না।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৪৫]

২. আযান শুনেও নবীজীর উপর দুরূদ পড়া জরুরি। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا .

যখন তোমরা মুআয্যিনের আওয়াজ শোন, তখন ঠিক তা-ই বলো, যা সে বলে। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করো। নিশ্চয় যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশ বার স্বীয় রহমত নাযিল করেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৪]

৩. মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুরূদ পাঠ করা উচিত। যেমন, পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন প্রথমে দুরূদ পাঠ করতেন। তারপর এই দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।

আবার যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন, তখনও প্রথমে দুরূদ পাঠ করতেন, তারপর এই দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ! اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ .

হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজা খুলে দিন।

[মুসনাদে আহমাদ : ৬/২৮২, ২৮৩]

৪. দোয়ার শেষেও নবীজীর উপর দুরূদ পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ .

যতক্ষণ পর্যন্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার দোয়া আসমান-জমিনের মাঝামাঝি ঝুঁলে থাকবে। বিন্দুমাত্রও উপরে উঠবে না।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৮৬]

৫. জুমার দিন নবীজীর উপর অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করা অত্যন্ত ফযীলত ও গুরুত্বপূর্ণ আমল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ .

নিঃসন্দেহে তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমার দিন। এ দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এ দিনই সিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এ দিনই মানুষকে বেহুঁশ করা হবে। (অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে) অতএব, এ দিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ প্রেরণ করো। কেননা, তোমাদে দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৪৭]

চতুর্থ হক

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাত সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত থাকা।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে সম্যক অবহিত থাকা। তাঁর অনুপম গুণাবলি ও আমলের বারবার পুনরাবৃত্তি করা। সকল প্রিয়জন, নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে তাঁর আলোচনা করা। মানুষকে তাঁর জীবনাদর্শ ও সুন্নাহর সাথে পরিচিত ও ঘনিষ্ট করে তোলা। তাঁর স্তুতি-বন্দনা ও প্রশংসা করা। তবে বাড়াবাড়ি না করা।

পঞ্চম হক

নবীজীর আনীত শরীয়ত অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে আমল করা। তাঁর সুন্নাতকে সর্বোতভাবে আপন করে নেওয়া। তাঁর বাণী, ইরশাদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও বার্তাসমূহের প্রচার-প্রসার করা। তাঁর নির্দেশনা ও হেদায়েতের বিরোধিতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা।

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় ক্ষেত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতকে সামনে রাখা। কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, হাসি-আনন্দ, চলা-ফেরা, শয়ন-জাগরণ এক কথায় জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, যে কোনো লেনদেনে কিংবা আচার-আচরণে, যে কোনো অবস্থা ও পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র তাঁরই অনুসরণ করা। যখনই আপনি তাঁর এই ফরমান শুনবেন, তখনই তা আমলে বাস্তবায়ন করুন–

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ، أَعْفُوا اللِّحى وَحَفُّو الشَّوَارِبَ .

তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো; দাড়ি বড় কর এবং গোঁফ কেটে ফেল।

[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২/৩৬৬ শব্দের ভিন্নতাসহ]
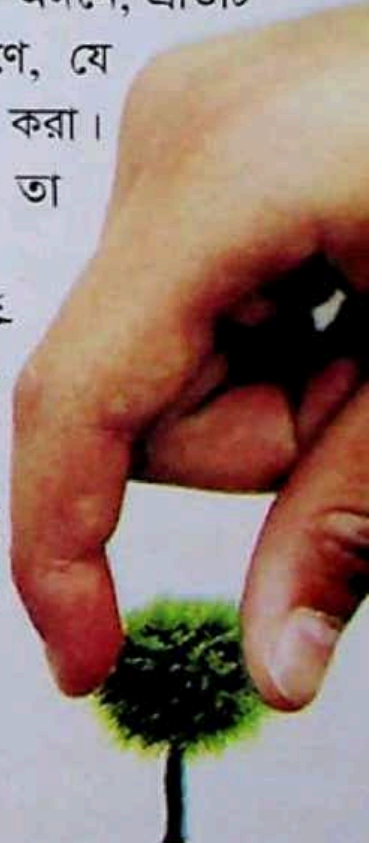
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন–

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ .

টাখনুর নীচে ঝুলে থাকা কাপড়ের অংশ জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

[সুনানুন্ নাসায়ী, হাদীস নং ৫৩৩২]

লক্ষ্য করুন, টাখনুর নীচে প্যান্ট-পায়জামা ইত্যাদি পরিধান করা কত বড় ভয়ঙ্কর গুনাহের কাজ! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, টাখনুর নীচে ঝুলে থাকা কাপড়ের অংশ জাহান্নামে পৌছে দিবে। অতএব, এখনই আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া দরকার এবং নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদকে সুন্নাত মোতাবেক বানিয়ে নেওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ; ওই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ(র সঙ্গে সাক্ষাৎ) এর এবং আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং অধিক হারে আল্লাহকে স্মরণ করে। [সূরা আহ্যাব : ২১]

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা উত্তম আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং নিজেদের আমলী যিন্দেগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকায় পরিচালিত করি।

অতএব, আমাদের সকলেরই সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া ও গানবাদ্যসহ সেসকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি, যা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি সেসকল কাজ করা উচিত, যে ব্যাপারে তিনি নির্দেশ করেছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পিতামাতার সঙ্গে উত্তম আচরণের আদেশ করেছেন। দান-সদকার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে সব সময়ই আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত।

নবীজীর কোনো বাণীর হেকমত ও ফায়দার ব্যাপারে আমাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র সংশয়-সন্দেহ থাকাও উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

মুমিনদের বক্তব্য কেবল এটিই, যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আদেশ মান্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।

[সূরা নূর : ৫১]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

অতএব, (হে মুহাম্মাদ!) তোমার পালনকর্তার কসম! ওই ব্যক্তি ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।

[সূরা নিসা : ৬৫]

ষষ্ঠ হক

আমাদের সকলের জন্য প্রতিক্ষণ প্রতিমুহূর্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে লেগে থাকা উচিত। যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদের সমাধান নবীজীর সুমহান বাণীতে অনুসন্ধান করা উচিত। নিজের যাবতীয় আনন্দকে নবীজীর আনন্দের তরে, নিজের যাবতীয় দুঃখকে নবীজীর দুঃখের তরে এবং নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নবীজীর আগ্রহের তরে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ .

বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। [সূরা নিসা : ৬৪]

নবীজীর আনুগত্যই জান্নাতের একমাত্র পথ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের ত্রিশেরও অধিক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। যেমনটি বর্ণনা করেছেন শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.। বরং আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার শব্দে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, জান্নাত একমাত্র তখনই লাভ করা যাবে, যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ আনুগত্য করা হবে এবং তাঁর প্রতিটি সুন্নাতকে আপন করে নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন যে ব্যক্তি নবীজীর পতাকাতলে আসতে পারবে, সে-ই জান্নাতের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। আর সেদিন নবীজীর পতাকাতলে কেবল সে-ই আসতে পারবে, যে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কুরআনে কারীম ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের আলোকে অতিবাহিত করেছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا • ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا .

আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তা হলে সে এমন লোকদের সঙ্গী হবে, যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গের। আর এঁরাই হল উত্তম সঙ্গী। এটা হল আল্লাহ প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

[সূরা নিসা : ৬৯-৭০]

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِيَ .

আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। একমাত্র সে-ই রয়ে যাবে, যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এমনও কি কেউ আছে, যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করতে পারে? নবীজী বললেন–

مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى .

যে আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করল। (কেননা, জান্নাতে প্রবেশের চাবি হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আদেশ মোতাবেক জীবন যাপন করা।)

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৮০]

নবীজীর আদব ও সম্মান

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদব ও ইহতিরাম শিক্ষা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। [সূরা হুজুরাত : ১-২]

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সামনে ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এই আয়াত শুনে আদব-ইহতিরামের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করে দেখিয়েছেন। নবীজীর আদব-ইহতিরাম ও সম্মান-মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা ছিল এই যে– যখনই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত নবীজী নিজেই তার উদ্দেশ্য বর্ণনা না করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাহাবী নিজের বুঝ মোতাবেক তার জওয়াব দেওয়ার দুঃসাহস দেখাতেন না। এই ভয়ে– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যের বিপরীত কোনো জওয়াব দেওয়ার ফলে তিনি আবার কোনো কষ্ট পেয়ে যান কি না!
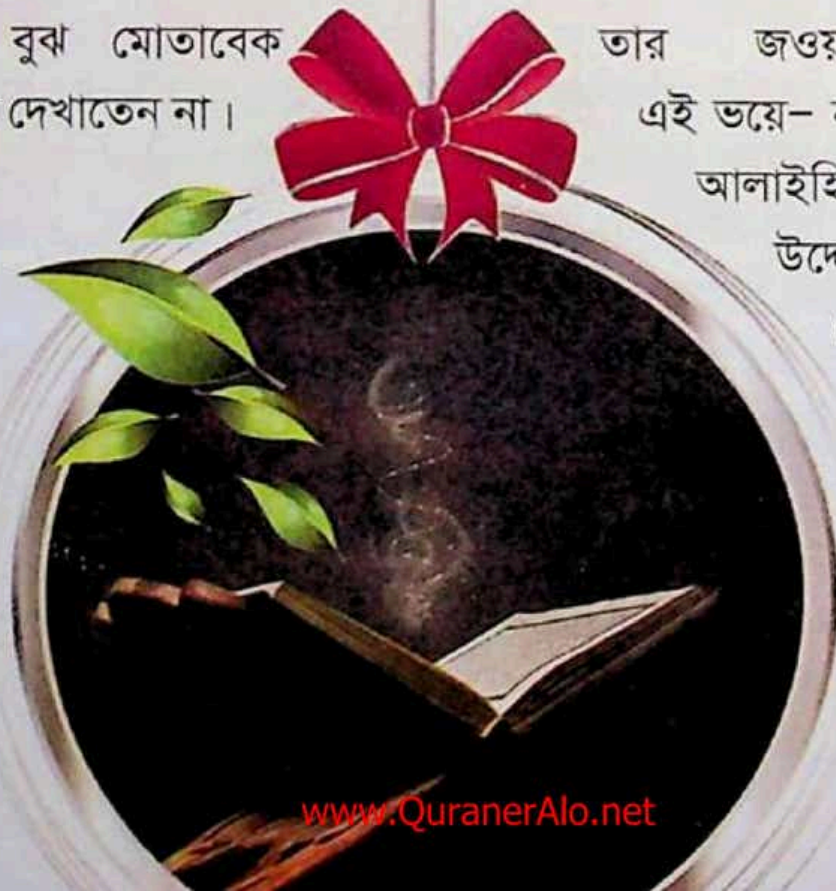
প্রিয় পাঠক! একবার ভেবে দেখুন! বিদায় হজের সময় যখন লক্ষাধিক সাহাবীর বিরাট এক জামাত নবীজীর সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে দিনটি ছিল কুরবানীর দিন; ঈদুল আযহার দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সাহাবীরা!

أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟

আজ কোন দিন? এটি কোন মাস? আর এটি কোন শহর?

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪০৬, মুসনাদে আহমাদ : ৫/৩৭]

এখানে এই একটিমাত্র বিষয়ই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশ্নের উত্তর সাহাবায়ে কেরামের জানা থাকলেও তাঁরা আদবের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।'

যার কাছেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো হুকুম এসে পৌছবে, তার জন্যই আবশ্যক হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের সামনে নিজের যাবতীয় কামনা-বাসনা, ও বংশীয় রেওয়াজ-রুসুম সব বিসর্জন দিয়ে মাথানত করে দেওয়া। অতঃপর কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার বা কোনো ক্ষমতাধরের ক্ষমতার তোয়াক্কা না করা; বংশীয় মান-মর্যাদা বা আত্মীয়তার বন্ধন– কোনো কিছুকেই সে হুকুমের সামনে প্রতিবন্ধক হতে না দেওয়া; পিতামাতা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পরিজন কিংবা ভাইবোনের মায়া-মহব্বত কোনো কিছুকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের মোকাবিলায় পরোয়া না করা। এক কথায় সবদিক থেকে চোখ বন্ধ করে আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
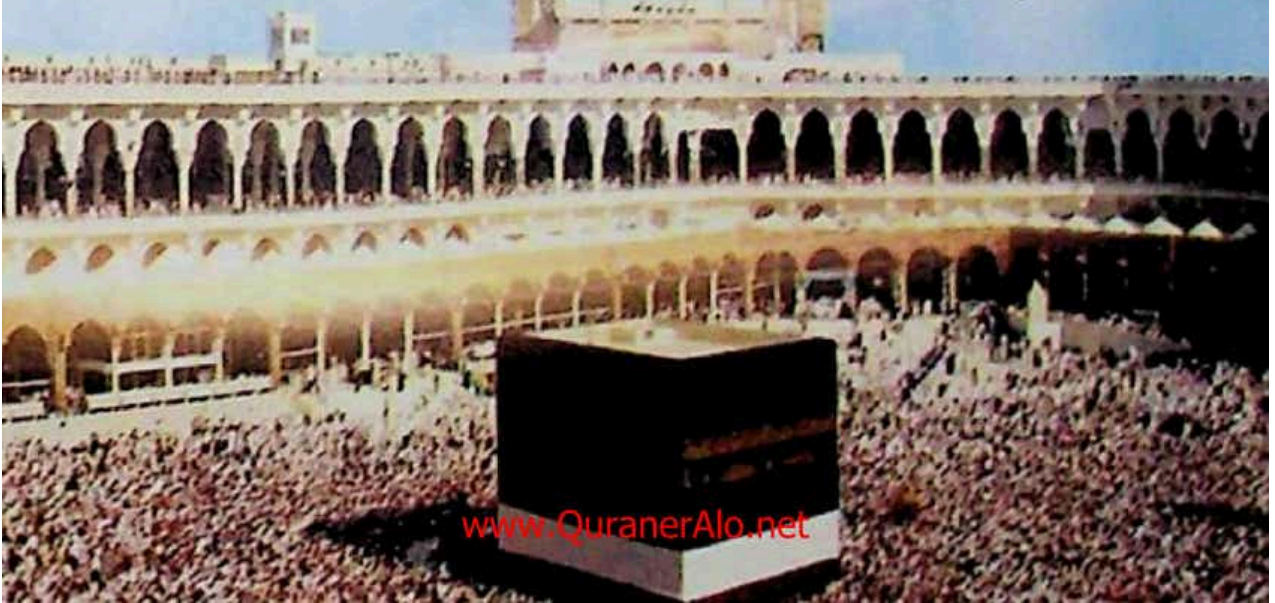
সাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে যাওয়া।

যদি কারও জন্য কোনো বস্তু রাসূলের আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তার জন্য উচিত, কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে এই চিন্তা করা ও সে অনুয়াযী সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যে– আমার কাছে কি আমার স্ত্রী বেশি প্রিয় না নবীজীর আদেশ মান্য করা বেশি প্রিয়? আমার বংশ আমার কাছে বেশি মূল্যবান না প্রিয় নবীজীর প্রিয় সুন্নাত বেশি মূল্যবান? আমার কামনা-বাসনা বেশি প্রিয় না নবীজীর আদর্শ বেশি প্রিয়? ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-সম্পদ আর রূপ-যৌবন বেশি প্রিয় না হাশরের ময়দানে নবীজীর হাতে হাউজে কাউসারের পানি পান করা বেশি প্রিয়? নবীজীর শাফাআত ও তাঁর পতাকাতলে থেকে জান্নাতে প্রবেশ করা বেশি প্রিয় না আমার স্বেচ্ছাচারী জীবন বেশি প্রিয়?

রাসূলের সুন্নাত উপেক্ষাকারীর হাশর কীর হবে?

প্রিয় বন্ধুগণ! চোখ বন্ধ করে একবার সেই ভয়াবহ দিনটির কথা ভেবে দেখুন! যদি সেদিন হাশরের ময়দানে আপনার মাঝে ও নবীজীর মাঝে প্রতিবন্ধকতার কোনো দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়, যদি হাউজে কাউসারের অধিপতি জিজ্ঞাসা করেন– 'হে আল্লাহ! এরা কি আমার উম্মত নয়?' আর আল্লাহ তাআলা যদি বলেন–

إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ .

'হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি জানেন না আপনার পর তারা আপনার ধর্মে কী কী পরিবর্তন করেছে!' আপনার ধর্মে কী কী রুসুম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার যুক্ত করেছে; আর তখন যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের ব্যাপারে বলে দেন যে–

سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ .

হে আল্লাহ! এদেরকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করে দিন। এমন ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে আমার পর আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে!

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৮৩, ৬৫৮৪]
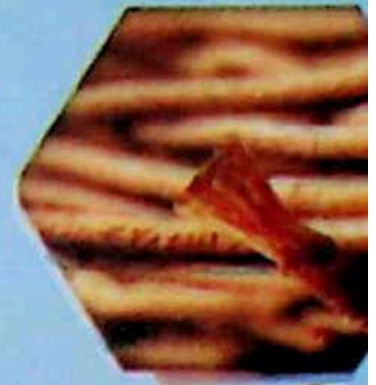
তা হলে বলুন! এমন ভয়াবহ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আপনি কোথায় যাবেন? কার কাছে যাবেন? কে আপনাকে রক্ষা করবে? আপনার সুপারিশের আশা আর নবীপ্রেমের মেকি দাবি কি আপনার কোনো উপকার করতে পারবে? আপনার স্ত্রী কি আপনাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে? আপনার বংশ কি আপনাকে সূর্যের ভয়ানক তেজ থেকে রক্ষা করতে পারবে? ভেবে দেখুন, যখন আপনি ঘামের সমুদ্রে হাবুডুবু খাবেন, পানির পরিবর্তে চোখ থেকে রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করবেন, আপনার ডানে-বামে-সামনে-পিছনে থাকবে শুধু আগুন আর আগুন, মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য জ্বলতে থাকবে, যা আপনাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে, পায়ের নীচে মাটি তামার ন্যায় উত্তপ্ত হবে, আপনার দেহ থেকে ঘাম এমনভাবে বের হতে থাকবে, যেন বিরাট কোনো পাহাড় থেকে ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে, তখন আপনি কী করবেন?

সে দিনটি এমনই 'ইয়া নাফসী'র দিন হবে যে, বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, স্বামী/স্ত্রী সকলেই সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। আর আপনি একা একা চিৎকার করে করে বলতে থাকবেন– 'হে আল্লাহ! প্রয়োজনে আমার সন্তানদের জাহান্নামে দিয়ে দিন, আমার স্ত্রী-পরিজন, ভাইবোন সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন, তবুও আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন!'

যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ * كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِلشَّوَى * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى .

সেদিন গুনাহগার ব্যক্তি (আযাব থেকে বাঁচার জন্য) পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে; তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে; তার গোষ্ঠীকে, যারা

তাকে আশ্রয় দিত; এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে (জাহান্নামের লেলিহান আগুন থেকে) রক্ষা করতে চাইবে। কখনোই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। যা চামড়া তুলে দিবে। সে সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও (সত্য থেকে) বিমুখ হয়েছিল। সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলে রেখেছিল।

[সূরা মাআরিজ : ১১-১৮]

এবার বলুন, সেদিন আপনার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিংবা ধন-সম্পদ কি কোনো কাজে আসবে? সেদিন আপনি বলবেন–

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.

আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো উপকারে এল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। [সূরা আল-হাক্কাহ : ২৮-২৯]

আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশ্‌তাদেরকে বলবেন–

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ.

ধর একে, গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে(র লেলিহান অগ্নিতে)। অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। [সূরা আল-হাক্কাহ : ৩০-৩২]

সেদিন কোনো হীলা-বাহানা, ছল-চাতুরী কিংবা কোনো তর্ক-বিতর্কই কোনো কাজে আসবে না। কাজে আসবে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মোতাবেক কৃত আমল। সেই আমল যদি আপনার কাছে না থাকে, তা হলে সেদিন আপনার ভাগ্যে আফসোস, অনুশোচনা আর আক্ষেপ ছাড়া কিছুই জুটবে না। আপনার অবস্থা হবে তেমন, যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا

(প্রত্যেক) জালিম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না
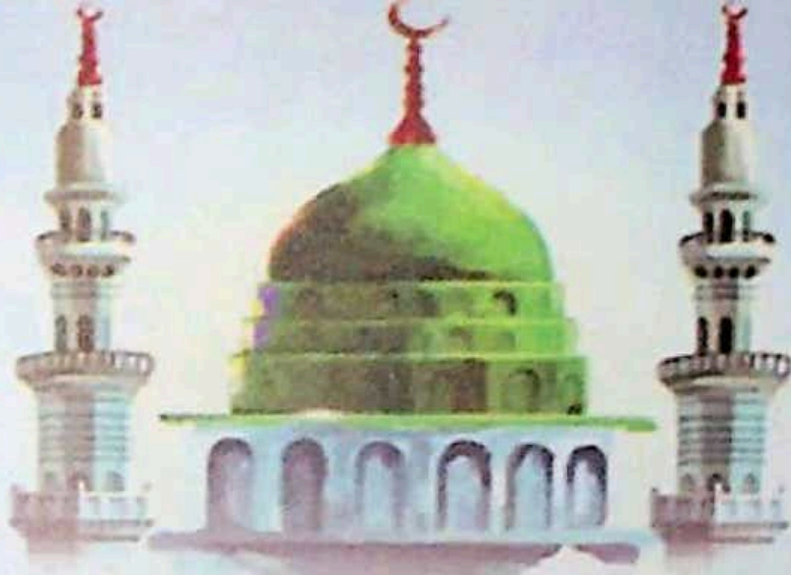
করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। [সূরা ফুরকান : ২৭-২৯]

সেই লাঞ্ছনা, অপমান ও ভয়াবহ আযাব থেকে বাঁচার একটাই পথ। আর তা হচ্ছে– ওই দিন আসার পূর্বেই তাওবা করুন। আলস্য পরিত্যাগ করুন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শকে নিজের রাহ্‌বার হিসেবে গ্রহণ করুন। যারা কেয়ামত দিবসের ব্যাপারে উদাসীন, তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআল ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ .

তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি। [সূরা সেজদাহ : ১২]

কিন্তু জওয়াবে আল্লাহ তাআলা বলবেন–

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

অতএব, এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা [শাস্তির] স্বাদ আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। [সূরা সেজদাহ : ১৪]

সুতরাং, ওই দিন আসার পূর্বেই নিজের জীবনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মোতাবেক পরিচালিত করতে শুরু করুন। যে কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম ও তরীকা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সে বিষয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ-আপত্তি

উত্থাপন করা অথবা তাবীল-ব্যাখ্যা করা কিংবা কোনো হীলা-বাহানা তালাশ করা কখনোই জায়েয নয়।

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নবীজীর আনুগত্যের উদ্দীপনা

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, [হিজরতের পর] শুরুর দিকে ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা হত। যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবাকে কিবলা নির্ধারণ করা হল এবং এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হল, তখন এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে মসজিদে কোবার লোকদের নিকট গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে ফজরের নামায আদায় করছেন। বর্ণিত সাহাবী জোর আওয়াজে চিৎকার দিয়ে বললেন, আজ রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তাতে বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবার দিকে ফিরে নামায আদায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

সাহাবী তাঁর কথা পূর্ণ করতে যতটুকু দেরি, সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম নামাযের মধ্যেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মুখ ঘুরিয়ে কাবার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই ছিল রাসূলের আনুগত্যের নমুনা! যখনই তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম শুনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে নামাযের মধ্যেই সে অনুযায়ী আমল করতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা এ কথা বলেননি যে– আপাতত এই নামাযটি সম্পন্ন করি। অতঃপর পরবর্তী ওয়াক্ত থেকে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামায আদায় করব...

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শরাব হারাম হওয়ার পূর্বে আমি আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরে লোকদেরকে শরাব পান করাতাম। যথারীতি একদিন আমি শরাব পান করাচ্ছিলাম। একে একে সাবাইকে শরাবের পাত্র দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ এক লোক এসে বলতে লাগলেন, 'তোমরা কি জান না?' সমবেত লোকজন জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে? আগন্তুক বললেন, শরাব হারাম করে দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষককে এই ঘোষণা প্রচার করে দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .

হে ঈমানদারগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? [সূরা মায়িদা : ৯০-৯১]

সাহাবায়ে কেরাম যখনই এই আয়াত শুনেছেন, আল্লাহর কসম! যে সাহাবীর হাতেই শরাবের পেয়ালা ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ এ বলে তা ফেলে দিয়েছেন যে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিরত হয়ে গেলাম। আমরা বিরত হয়ে গেলাম। কেউ-ই শরাবের পেয়ালা ঠোঁট পর্যন্ত ওঠাতে দুঃসাহস করেননি। অতঃপর সকল সাহাবায়ে কেরাম এক এক করে শরাবের সমস্ত মট্‌কা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৬৪, ৪৬১৭]

এরপর না কোনো আগন্তুক ভিতরে এসেছে আর না ভিতরের কেউ বাইরে গিয়েছে, এরই মধ্যে সকলেই শরাবের মট্‌কা উপুড় করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। আর মদীনার অলিতে-গলিতে এমনভাবে শরাব প্রবাহিত হতে লাগল, যেন শরাবের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তারপর সাহাবায়ে কেরাম ওযু করলেন, কেউ কেউ গোসলও করলেন, অতঃপর খোশবু লাগিয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁরা না কোনো হীলা অবলম্বন করেছেন না কোনো বাহানা দাঁড় করিয়েছেন। শুধুমাত্র একজন সাহাবীর কথায় সবকিছু ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কেউ-ই এ কথা বলেননি যে, এ তো আমাদের বহু বছরের পুরনো অভ্যাস, এ অভ্যাস তো আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতি, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা তা পেয়েছি, অতএব এটা আমরা পরিত্যাগ করব কীভাবে? এ ধরনের কথা কেউ-ই বলেননি। বরং তাঁরা আদেশ মান্য করার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত কায়েম করে দেখিয়ে দিয়েছেন। শরাব তৈরির সমস্ত কারখানা ভেঙ্গে ফেলেছেন। একজন শরাব পানকারীও বাকি ছিল না। এঁরাই হলেন ঈমানদার, যারা নিজেদের কামনা ও চাহিদাকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দীর জন্য কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চিন্তা-ফিকির ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছেন।

একবার এক সাহাবী স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করেছিলেন। তার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি পড়তেই তিনি তা আঙ্গুল থেকে খুলে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন–

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ .

তোমাদের কেউ আগুনের অঙ্গার নেয় এবং তা নিজের হাতে পরিধান করে।

এ কথা বলে নবীজী চলে যাওয়ার পর অন্যান্য সাহাবীগণ ওই সাহাবীকে বললেন, আংটিটি তুলে নাও! এটি অন্য কোনো কাজে লাগাতে পারবে।

(নিজের মা-বোন কিংবা স্ত্রীকে দিয়ে দিতে পারবে অথবা এটি বিক্রি করে অন্যকিছু ক্রয় করতে পারবে) ওই সাহাবী জওয়াব দিলেন, যে বস্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেলে দিয়েছেন, আমার ভিতর এত বড় দুঃসাহস নেই যে, তা উঠিয়ে আমি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করব।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৯০]

নবীজীর সবচেয়ে বড় হক

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে তাঁর সুন্নাতের কদর রক্ষা করা। নবীজীর সুন্নাত ও শিক্ষার পরিপন্থী কোনো কাজ করা ও তাঁর সুন্নাতকে হেয় করা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। যে ব্যক্তি ইত্তিবায়ে রাসূলের জযবা নিয়ে নিজের বাহ্যিক অবয়ব, আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা মোতাবেক ঢেলে সাজাবে, তাকে ছোট মনে করে হাসি-মজাক করা ও তিরস্কার-সমালোচনার পাত্র বানানো অত্যন্ত ভয়ংকর দুঃসাহিকতা। সুন্নাতে নববীর অনুসারীদে হেয় করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা মুনাফেকি আলামত। আর মুনাফিকরা দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম লোক। কেয়ামতে দিন যখন জান্নাতীরা জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করবে–

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.

কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না। অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম– আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের

কোনো উপকারে আসবে না। [সূরা মুদ্দাস্সির : ৪২-৪৮]

হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ .

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলেছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (এখন) ছলনা করো না, তোমরা তো কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। [সূরা তাওবা : ৬৫-৬৬]

একটু ভাবুন!

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! পরিশেষে শুধু এটুকুই বলব– আমাদের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হকসমূহ রয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। আমাদের খুব ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত যে, গোলামের উপর মালিকের হকসমূহ ও সন্তানদের উপর পিতামাতার হকসমূহের আদব-ইহতিরামের প্রতি যতটা লক্ষ্য রাখা জরুরি, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি জরুরি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হকসমূহের আদব-ইহতিরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও সেগুলোকে পরিপূর্ণরূপে আদায় করা; তাঁর অনুপম আদর্শকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মাথার মুকুট বানিয়ে রাখা; আমাদের ওঠাবসা, চলাফেরা, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, শয়ন-জাগরণ এককথায় দিনরাতের যাবতীয় ব্যস্ততা ও কাজকর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান মোতাবেক হওয়া। কারণ,

তিনিই সেই সত্তা, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জাহান্নামের শিখাময় অগ্নি থেকে মুক্তি দিয়েছেন; তাঁর মাধ্যমেই আমাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে এনেছেন; হেদায়েতের নূরের দিকে পথ দেখিয়েছেন; সীরাতে মুস্তাকীমের পথিক বানিয়েছেন। আরে! তিনি তো আমাদের চিন্তায় রাতের পর রাত জেগে থাকতেন। আমাদের পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌছে দেওয়ার জন্য এমন কোন্ কষ্ট আছে, যা তাঁকে দেওয়া হয়নি? এমন কোন্ মসিবত আছে, যা তিনি সহ্য করেননি? তাঁকে কি কবি, উন্মাদ, পাগল, জাদুকর, বেদ্বীন বলা হয়নি? তাঁকে কি তিন বছর পর্যন্ত 'শিয়াবে আবী তালেব'-এ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত রেখে গাছের পাতা খেতে বাধ্য করা হয়নি? তাঁকে কি আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি? ঘর থেকে বহিষ্কার ও জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়া হয়নি? তায়েফের দুষ্ট লোকেরা পাথর মেরে মেরে তাঁর জুতা মোবারক কি রক্তে রঞ্জিত করেনি? অথচ তিনি গিয়েছিলেন তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য; নিজের সঙ্গে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য! উহুদের ময়দানে কি তাঁর দাঁত শহীদ করা হয়নি?

ওহে সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসিতায় জীবন যাপনকারীগণ! তোমরা কি সেই নবীর জন্য একটি পাথরের আঘাতও খেতে পার না, যিনি দিনের বেলায় গালি ও পাথরের আঘাত খেয়ে খেয়ে মানুষকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহ্বান করতেন আর রাতের বেলায় সেই পাথর নিক্ষেপকারী জালিমদের জন্যই কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতেন; আল্লাহর দরবারে তাদের ক্ষমার জন্যই ফরিয়াদ করতেন।

মানুষের হেদায়েতের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পরিমাণ চিন্তা-ফিকির ও ভাবনা ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا .

যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত তুমি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবে!

ওহে মুসলমান! তোমরা কি সেই নবীর দ্বীন হেফাজতের জন্য একটি কদমও ওঠাতে পার না? একটি গালিও সহ্য করতে পার না? কেন পার না? কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তোমরা কোন্ মুখে দাঁড়াবে, যখন সমস্ত নবী-রসূলগণ পর্যন্ত সুপারিশ করতে অস্বীকার করে দিবেন? অবশেষে তিনিই সুপারিশের জন্য সেজদায় মাথা লুটাবেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন–

يَا مُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ .

হে মুহাম্মাদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন। আপনি যা প্রার্থনা করবেন, তা-ই দেওয়া হবে। আপনি যার জন্যেই সুপারিশ করবেন, তা কবুল করা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন–

أُمَّتِي يَارَبِّ! أُمَّتِي يَارَبِّ!

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে বাঁচান। হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে বাঁচান।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭১২]

জামার আঁচলে মুখ লুকিয়ে আমাদের একবার ভেবে দেখা উচিত, আমরা তাঁর সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত কি না? ভেবে দেখা উচিত, আমাদের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ ও যাবতীয় বিষয়াদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার প্রতিনিধিত্ব করছে না তো? এমন হচ্ছে
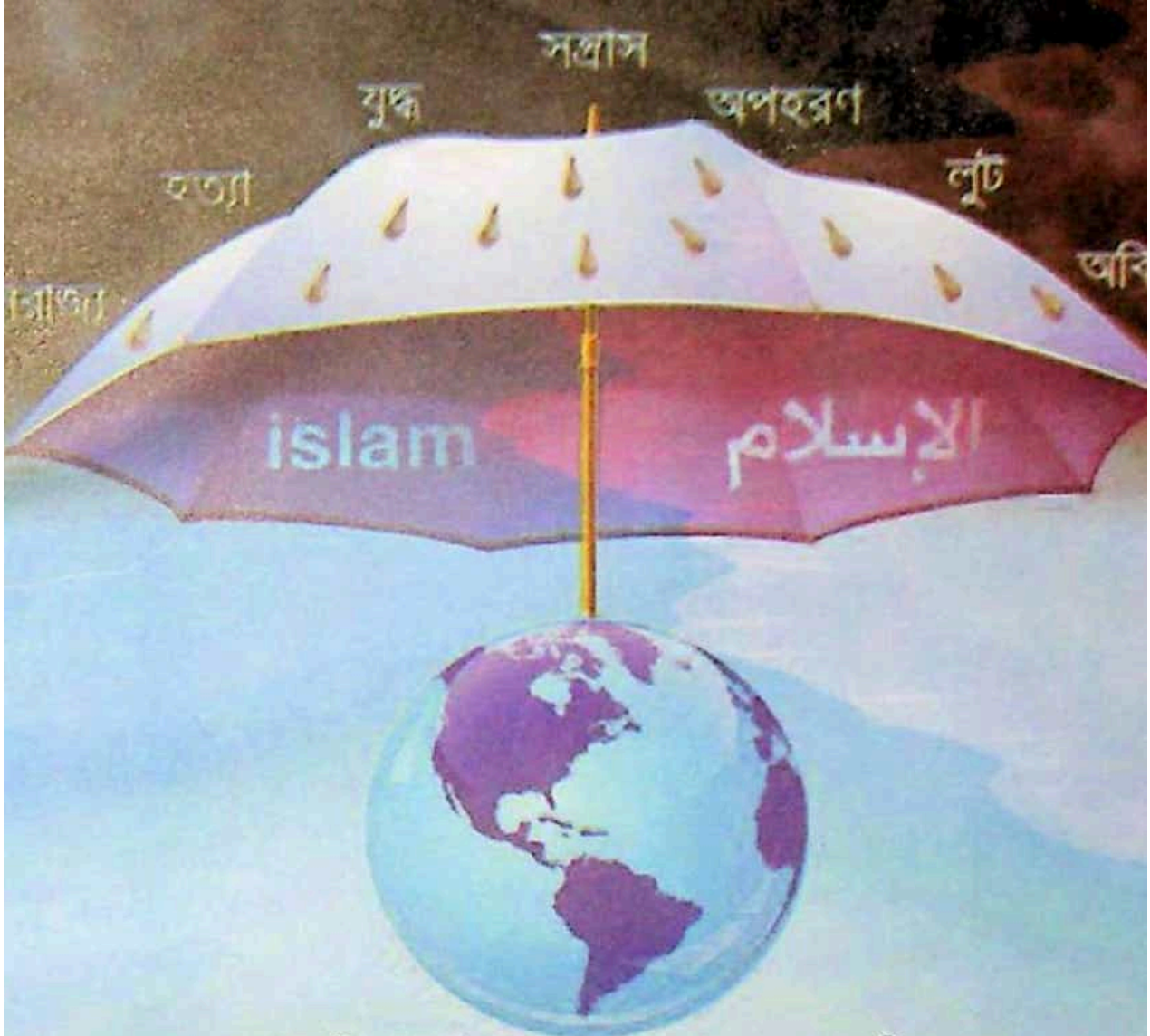
তো যে, আমরা একটি কাজ ইবাদত মনে করে করছি, অথচ তা আমাদের জন্য মসিবতের কারণ হচ্ছে? কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ • تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً .

(আমলে) অত্যন্ত মেহনতকারী ও ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হবে। (তারপরও) জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। [সূরা গাশিয়া :৩-৪]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সর্তক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। [সূরা নূর : ৬৩]

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা এর চাইতেও শক্ত ভাষায় ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

আর যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল। [সূরা নিসা : ১১৫]

আসুন! আমরা সবাই মিলে আল্লাহ তাআলা দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি– হে আল্লাহ! হে প্রতিদান দিবসের মালিক! আপনি আমাদেরকে আমাদের যাবতীয় কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক করার তাওফীক দান করুন। কেয়ামতের দিন আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআতের উপযুক্ত করুন। তাঁর সুপারিশের মাধ্যমে আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন। আমাদেরকে তাঁর পতাকাতলে থেকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

হে আমাদের মালিক! আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিকির ও আমলের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাঁর পর আমাদেরকে পরীক্ষায় লিপ্ত করবেন না। আমাদেরকে ফেতনা ও ফেরকাবাজি থেকে হেফাজত করুন। হাশর দিবসের সুপারিশকারীর মোবারক হাত থেকে হাউজে কাউসারের পানি পান করার তাওফীক দান করুন, যে পানি পান করলে আর কখনও তৃষ্ণা পাবে না। আমীন... আমীন...

আসুন প্রতিজ্ঞা করি..

ধুমপান
করব না

দায়িত্বে
অবহেলা
করব না

অসহায়ের
সহায়
হব

পরিচ্ছন্নতা
বজায়
রাখব

ঘুষ,
দেব না
নেব না

ট্রাফিক
সিগন্যাল
মেনে চলব

একগুয়েমি
করব না

অপরের
মতামত
মূল্যায়ন
করব

মেয়েদের
বিরক্ত
করব না

ক্ষমাশীল
হব

ইতিবাচক
মনোভাবী
হব

মিথ্যা
বলব না